স্বীকার অতুলনীয় হইলেও রঘুও তদ্বিষয়ে পিতার অনুরূপ ছিলেন।

পঞ্চম সর্গের শেষে যে কয়েকটী শ্লোকে বৈতালিকগণ কুমার অজের নিদ্রাভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিতেছে উহা অতিশয় মনোহর। শ্লোক কয়টী সুরসংযোগে কলাবতেরা গান করিয়া থাকেন। শ্লোকগুলি যেমন মিষ্ট তেমনই মনোহর; কবির বর্ণনা-শক্তির অতিমাত্র পরিচয় প্রদান করিতেছে। পূর্ব্বকালে রাজপুত্রগণের নিদ্রাভঙ্গ করণের কিরূপ ব্যবস্থা ছিল তাহাও এত-দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। প্রভাতে অশ্বদিগকে সৈন্ধবশিলা প্রদান করিবার ব্যবস্থা ছিল তাহাও জানিতে পারা যায়। পঞ্চম সর্গের শেষ শ্লোকগুলি সকলেরই কণ্ঠস্থ রাখা কর্ত্তব্য। স্বভাব বর্ণনায় এরূপ লালিত্য ও মাধুর্য্য সংস্কৃত ভাষায় অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। কালিদাসের কৃতীত্ব এই স্থানে। হস্তীরা পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া উঠিতেছে, অশ্বেরা সৈন্ধবশিলা লেহন করিয়া মলিন করি-তেছে, পিঞ্জরস্থ শুকপক্ষী বন্দীপুত্রগণের বাক্য অনুকরণ করিতেছে। এসকল কে না দেখিয়া থাকেন? এ সকল অতি তুচ্ছ বিষয় নহে কি? কিন্তু বর্ণনার গুণে শ্লোক কয়টী এত মিষ্ট বলিয়া বোধ হয় যে যিনি একবার এগুলি পড়িয়াছেন তিনি আর কখনও ভুলিতে পারেন না।

ষষ্ঠ সর্গ। এই সর্গে ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর বর্ণনীয় বিষয়। স্বয়ম্বর-সভার শোভা, সভাস্থানে ইন্দুমতীর প্রবেশ, ইন্দুমতীকে দেখিয়া সমাগত রাজগণের চিত্তচাঞ্চল্য প্রকাশ, অতিমাত্র নিপুণতার সহিত চিত্রিত হইয়াছে। স্বয়ং প্রত্যক্ষ না করিলে এরূপ চিত্র অঙ্কিত করা সম্ভব নহে। কালিদাসের সময় স্বয়ম্বর প্রথা প্রচলিত ছিল।

স্বয়ম্বর সভায় ইন্দুমতীর পরিচারিকা সুনন্দা ইন্দুমতীর নিকট রাজগণের বংশাবলী কীর্ত্তন ও কুলশীলের যথাযথ পরিচয় দিয়াছে। এবং তাঁহাকে এক রাজার নিকট হইতে অন্য রাজার নিকট লইয়া গিয়াছে। সুনন্দা সমাগত রাজগণের গুণকীর্ত্তনে বেশ পটুতা দেখাইয়াছে। এবং যখন ইন্দুমতী কুমার অজকে পতিত্বে বরণ করিলেন, তখন একটু রসিকতা করিতেও ভুলে নাই। সুনন্দাকে দেখিয়া মনে হয় পূর্ব্বকালেও ঘটকীর অভাব ছিল না। স্ত্রীলোকেরাও তখন কুলশীলের যথাযথ পরিচয় দিতে পারিতেন।

কুমারসম্ভবের ষষ্ঠ সর্গ ও রঘুর ষষ্ঠ সর্গ পড়িলে মনে হয় কবিরও যেন ঘটকালী ব্যবসা ছিল। তিনি যেন আজন্ম এই কার্য্য করিয়াছেন।

ইন্দুমতীর স্বয়ম্বরে প্রধানতঃ মগধরাজ পরন্তপ, সুপণ্ডিত অঙ্গদেশের রাজা, উজ্জয়িনীর নৃপতি, মাহিষ্মতীপতি অনুপরাজ, শূরসেন (মথুরা) পতি সুষেণ, কলিঙ্গরাজ হেমাঙ্গদ, পাণ্ড্যদেশের রাজা, কামরূপের অধিপতিও উপস্থিত ছিলেন। রঘুর চতুর্থ সর্গে বঙ্গ ও প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের উল্লেখ আছে। কিন্তু স্বয়ম্বর সভায় তাঁহাদের উল্লেখ নাই। উজ্জয়িনীরাজের বর্ণনায় কবি যেন একটু পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়াছেন। অবন্তিনাথ বন্ধুগণের আনন্দদায়ক, শত্রুকুলের সংহারক এবং সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান। তথাপি কুমুদ্বতী যেমন সূর্য্যের প্রতি অনুরাগিনী হয় না, ইন্দুমতীও সেইরূপ তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন নাই। কুমার অজকেই বরমাল্যদানে ইন্দুমতী সম্মানিত করিয়াছিলেন। একে অজের নবীন বয়স ও সুন্দর দেহশ্রী তাহাতে তিনি অকৃতদার সুতরাং এরূপ বর ত্যাগ করিয়া বহুভার্য্য নৃপতিকে পতিত্বে বরণ করিয়া ইন্দুমতী সপত্নীজ্বালা সহিতে

যাইবেন কেন? তিনি অনুরূপ বরই মনোনীত করিয়াছিলেন। স্বামীকে অবাধে ভোগদখল করিতে কোন্ রমণীর না বাসনা হয়?

সপ্তম সর্গ। অজ ও ইন্দুমতীর পরিণয় এই সর্গে বর্ণিত হইয়াছে। কুমারসম্ভবের সপ্তম সর্গে হরপার্ব্বতীর পরিণয় বর্ণনায় যে শ্লোকগুলি দেখা যায় এস্থলেও অবিকল সেইগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। একই বস্তু বর্ণনার জন্য কবি আর বিভিন্ন শ্লোক রচনা করেন নাই।

বিবাহান্তে অযোধ্যা গমনের সময় কুমার অজকে বিপন্ন হইতে হইয়াছিল। স্বয়ম্বরে অকৃতকার্য্য রাজগণ বলপূর্ব্বক ইন্দুমতীকে হরণ করিবার বাসনায় পথে কুমার অজকে আক্রমণ করেন। অজ বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া একাকী গন্ধর্ব্বদত্ত দিব্যাস্ত্র প্রভাবে শত্রুগণের পরাজয় সাধন করিলেন। গৃহে প্রত্যাগত অজকে রঘু আদরের সহিত গ্রহণ করিলেন। এবং তাঁহাকে রাজ্যভার দিয়া বনগমনের উদ্যোগ করিলেন।

অষ্টম সর্গ। অজকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া মুক্তি কামনায় রঘু বনগমনে উদ্যত হইলে অজ অশ্রুপূর্ণলোচনে তাঁহাকে রাজধানী ত্যাগ করিতে ও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে নিষেধ করিলেন। পুত্রের ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া রঘু বনগমন করিলেন না। নগরের প্রান্তভাগে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তথায় যোগাভ্যাস করিতে লাগিলেন। যথাকালে রঘু নির্ব্বাণ লাভ করিলে অজ তাঁহার দেহ সমাহিত করিয়া অনাবশ্যক হইলেও বহু সমারোহে পিতৃশ্রাদ্ধ করিলেন। অনন্তর ইন্দুমতীর গর্ভে দশরথ জন্মিলেন। রাজা অজ রাজকার্য্য হইতে একটু বিশ্রামলাভের ইচ্ছায় একদিন ভার্য্যাসহ উদ্যান বিহারে গমন করিলেন। যখন তাঁহারা অতিমাত্র

আনন্দ উপভোগ করিতেছেন, সেই সময় বিমানমার্গ হইতে দেবর্ষি নারদের বীণাস্খলিত একছড়া দিব্য পুষ্পমালা ইন্দুমতীর স্তনাগ্রে পড়িল। অমনই ইন্দুমতীর প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। অজ পত্নী-প্রেমে অত্যন্ত বিভোর ছিলেন এজন্য তাঁহার বিয়োগে নিতান্ত অধীর হইলেন। তিনি লোকলজ্জাবশতঃ পত্নীর সহগমন করিতে পারিলেন না বটে কিন্তু মৃত পত্নীর ধ্যানে, চিত্রপট দর্শনে ও স্বপ্ন-সমাগমলাভে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। দশরথ নিতান্ত শিশু থাকায় তিনি অতিকষ্টে আট বৎসর কাটাইলেন। গুরু-পুরোহিতের প্রবোধ বাক্যে, শাস্ত্র কথায় বা বন্ধুজনের সহানুভূতি সূচক সান্ত্বনায় তাঁহার মন সুস্থির হইল না। তিনি প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করিলেন।

নবম সর্গ। এই সর্গে দশরথের রাজ্যলাভ, তাঁহার দিগ্বিজয়, প্রজাপালন, কৌশল্যা, সুমিত্রা ও কৈকেয়ীর সহিত বিবাহ, বিহার ও মৃগয়া ব্যাপার বর্ণিত হইয়াছে। এই সর্গের বসন্তবর্ণনা কুমার-সম্ভবের তৃতীয় সর্গের অকালবসন্তবর্ণনার ন্যায় চমৎকারিণী না হইলেও বিশেষ তৃপ্তিপ্রদ।

মৃগয়া করিতে যাইয়া দশরথ অন্ধমুনির পুত্রকে ভ্রমক্রমে শরবিদ্ধ করেন। এই মুনিপুত্র বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে জন্মিয়াছিলেন। মুনি পুত্রের আর্তনাদে দশরথ তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া তাঁহার পিতা মাতার নিকট উপস্থিত হইলেন। পুত্রশোকে অন্ধমুনি দশরথকে অভিশাপ দিলেন যে তাঁহারও পুত্রশোকে মৃত্যু ঘটিবে। অনন্তর অন্ধমুনির ইচ্ছামত দশরথ তাঁহাদের চিতা প্রস্তুত করিয়া দিলে মুনি, ভার্য্যার সহিত পুত্রশোকে চিতাপ্রবেশ করিলেন। দশরথ ক্ষুণ্ণমনে রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

দশম সর্গ। এই সর্গে রামচন্দ্র প্রভৃতি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের জন্ম কথিত হইয়াছে। রাজা দশরথ মৃগয়া ব্যাপারে ক্লান্ত হইয়া রাজধানীতে আগমন করিলেন। দীর্ঘকাল (দশহাজার বৎসর) অতীত হইল তথাপি তিনি পুত্রমুখ দর্শন করিতে পারিলেন না। অনন্তর ঋষ্যশৃঙ্গ প্রভৃতি মহর্ষিগণের দ্বারা তিনি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। এদিকে লঙ্কাধিপতি দশাননের ভয়ে অতিমাত্র ভীত হইয়াছিলেন। রাবণের অত্যাচারে তিনলোক তাপিত হইয়াছিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া দেবগণ হরির শরণাপন্ন হইলেন। তিনিও তাঁহাদিগকে অভয় দিয়া কহিলেন, দশাননের সংহার জন্য শীঘ্রই তিনি দশরথ গৃহে অবতীর্ণ হইবেন। এদিকে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সমাপনান্তে যে পায়স চরু উত্থিত হইল রাজা দশরথ কৌশল্যা ও কৈকেয়ীকে তাহা তুল্যাংশে বিভাগ করিয়া দিলেন। তাঁহারা সপত্নী সুমিত্রাকে তাহার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভাগ দিলেন। অবিলম্বে মহিষীগণ গর্ভিনী হইলেন। যথাসময়ে রাম, ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন জন্মগ্রহণ করিলেন। রাম ও লক্ষ্মণের মধ্যে অত্যন্ত প্রণয় জন্মিল। ভরত ও শত্রুঘ্ন মধ্যেও তদ্রূপ প্রীতি সঞ্চারিত হইল। চারি ভ্রাতাই রূপে, গুণে, বিনয়ে প্রকৃতিপুঞ্জের মন হরণ করিয়াছিলেন। এই সর্গের ৫৩ শ্লোক হইতে ভট্টিকাব্যের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

এই সর্গের দেবগণ কৃত নারায়ণ স্তুতির সহিত কুমারের দ্বিতীয় সর্গের ব্রহ্মাস্তবের—সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। কালিদাস যে তিন মূর্ত্তি অভিন্ন ভাবিতেন তাহার স্পষ্ট আভাস ইহা হইতে পাওয়া যায়। তাঁহাকে শৈব বলিবার যেরূপ যুক্তি আছে বৈষ্ণব বলিবারও ততোধিক যুক্তি দেখা যায়।

একাদশ সর্গ। এই সর্গে সীতার বিবাহ বর্ণিত হইয়াছে।

মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সহিত রাম ও লক্ষ্মণের যজ্ঞরক্ষার্থে গমন, তাড়কা রাক্ষসী বধ, মারীচ প্রভৃতি রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ, মারীচের পরাভব, অতঃপর নির্ব্বিঘ্নে যজ্ঞ সমাপন বর্ণিত হইয়াছে। তৎপরে মিথিলাধিপতি জনকের যজ্ঞে বিশ্বামিত্র নিমন্ত্রিত হইলেন। তথায় ধনুর্ভঙ্গরূপ পণ শুনিয়া ভ্রাতৃদ্বয় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছেন জানিয়া মহর্ষি রাম লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন। পথে অহল্যার শাপমোচন করিয়া গৌতমপত্নীকে পূর্ব্বদেহ প্রদান করিলেন। রাজর্ষি জনক তাঁহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং যজ্ঞ সমাপনান্তে বিশ্বামিত্রের অনুরোধক্রমে রামসমীপে হরধনু আনয়ন করিলেন। রামচন্দ্র অবলীলাক্রমে সেই ধনু ভগ্ন করিলেন। জনক প্রফুল্লচিত্তে তাঁহাকে সীতা সম্প্রদানে উদ্যোগী হইয়া দশরথের নিকট নিজ পুরোহিতকে পাঠাইলেন। দশরথ আগমন করিলে শুভদিনে চারি ভ্রাতার পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন হইল। রাম অযোনিসম্ভবা সীতাকে, লক্ষ্মণ জনকদুহিতা উর্ম্মিলাকে, ভরত জনকভ্রাতা কুশধ্বজের কন্যা মাণ্ডবীকে ও শত্রুঘ্ন তৎকনিষ্ঠা শ্রুতকীর্ত্তিকে বিবাহ করিলেন। যথারীতি বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইলে রাজা দশরথ পুত্র ও অমাত্যগণের সহিত অযোধ্যাযাত্রা করিলেন। ক্ষত্রিয়ান্তক পরশুরাম রামকর্তৃক হরধনুর্ভঙ্গের কথা শ্রবণ করিয়া রোষাবিষ্ট চিত্তে তাঁহাদের সম্মুখীন হইলেন। বৃদ্ধ রাজা দশরথ পরশুরামকে দেখিয়া ভীত হইলেন এবং তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ভার্গব তাহা লক্ষ্য না করিয়া কুমার রামকে অন্য একখানি শরাসনে জ্যারোপণ করিবার আদেশ করিলেন। কুমার রাম অবলীলাক্রমে সেই কার্ম্মুকে জ্যারোপণ করিলেন। ভার্গব নিতান্ত অপ্রতিভ হইলেন। তখন

তিনি যথাবিধি রামকে তুষ্ট করিলেন। কুমার রামও বিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া ভার্গবের পাদস্পর্শ করিলেন। পরশুরাম তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

এই সর্গে ও পরবর্ত্তী সর্গে কালিদাস রামায়ণ যথাযথ অনুসরণ করিলেন।

দ্বাদশ সর্গ—এই সর্গে রাবণবধ বর্ণনীয় বিষয়। কালিদাস অতি সংক্ষেপে রামের রাজ্যাভিষেকের আয়োজন, কৈকেয়ীর প্রতিকূলাচরণ, রামের বনগমন হইতে রাবণবধ পর্য্যন্ত যাবতীয় বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। রামায়ণের সারসঙ্কলন করিলেও কালিদাস নিজ কবিত্বের পরিচয় প্রতি শ্লোকেই দিয়াছেন। কোন স্থান নীরস বা অপ্রীতিকর হয় নাই। বরং রামায়ণের বহুবিস্তৃত বর্ণনাপেক্ষা এই সারসঙ্কলন অধিক প্রীতিকর হইয়াছে।

ত্রয়োদশ সর্গ—এই সর্গে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন বর্ণনীয় বিষয়। কালিদাস এই উপলক্ষে সমুদ্র, মলয়পর্ব্বত, জনস্থান, পঞ্চবটী প্রভৃতি স্থানের এরূপ মনোহারিণী বর্ণনা করিয়াছেন যে ইহা পড়িয়া মনে হয় কবি এ সকল স্থান নিশ্চয়ই স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। রামচন্দ্র পুষ্পকরথে আকাশপথে গমন করিতে করিতে সীতাকে বনবাস সময়ের পরিচিত স্থান ও জনপদগুলি দেখাইতেছেন। দশানন সীতাকে হরণ করিলে রাম কোথায় সীতার কি চিহ্ন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কোথায় কিরূপে অবস্থিতি করিয়াছিলেন তাহা দেখাইয়া সীতার মনোরঞ্জন করিতেছেন। এই বর্ণনায় কালিদাস যেরূপ কবিত্বশক্তি ও রচনাকৌশল দেখাইয়াছেন তাহা বুঝাইয়া দেওয়া অসাধ্য। কালিদাস নিজ প্রতিভার সম্যক পরিচয় এই সর্গে দিয়াছেন।

রামচন্দ্র ভরতের সহিত মিলিত হইয়া কুলগুরু বশিষ্ঠদেব ও মন্ত্রীগণের সহিত অযোধ্যাগমন করিলেন এবং বহিরুপবনস্থ পট-মণ্ডপে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

চতুর্দ্দশ সর্গ—এই সর্গে সীতা পরিত্যাগ বর্ণনীয় বিষয়। এই সর্গের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক হইতে উত্তরচরিতের প্রথম অঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া অনুমান হয়।

তয়োর্যথা প্রার্থিতমিন্দ্রিয়ার্থান্
আসেদুষোঃ সদ্মসু চিত্রবৎসু।
প্রাপ্তানি দুঃখান্যপি দণ্ডকেষু
সংচিন্ত্যমানান্ সুখান্যভুবন্ ॥

এই সর্গে রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক, প্রজাপালন, প্রজারঞ্জনের জন্য নির্দ্দোষ জানিয়াও সীতাকে লোকাপবাদভয়ে পরিত্যাগ, লক্ষ্মণকর্ত্তৃক পতিপ্রাণা সীতাকে বাল্মীকি তপোবনে বর্জ্জন, তথায় বাল্মীকি ও মুনিকন্যাগণ কর্ত্তৃক সীতার সম্বর্দ্ধনা, বর্ণিত হইয়াছে। রামচন্দ্র সীতাকে দোষশূন্যা জানিয়াও বিসর্জ্জন করেন ইহা সাধুতাবিগর্হিত। মহর্ষি বাল্মীকিও এজন্য রামের উপর সন্তুষ্ট হন নাই। গুপ্তচরের মুখে সীতার প্রতি প্রকৃতিপুঞ্জের অবিশ্বাস শুনিয়া রামচন্দ্র স্বয়ং সীতাকে শুদ্ধস্বভাব জানিলেও গর্ভাবস্থাতেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবার সংকল্প করিলেন। রাজধর্ম্ম রক্ষার জন্য প্রিয়তমা ভার্য্যাকেও ত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। লক্ষ্মণও রামের উপযুক্ত ভ্রাতা। হিতাহিত বিচার করিয়া গুরুর আজ্ঞা পালন করা তিনি আবশ্যক মনে করিতেন না। তাঁহার নিকট গুরু আজ্ঞা অবিচারণীয়া, সেইজন্য সীতার কষ্টে ম্রিয়মান হইলেও ভ্রাতৃআজ্ঞা পালন করিলেন। রামচন্দ্র তৎপরে অশ্বমেধ

যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। সীতার সুবর্ণময়ী প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করিয়া শাস্ত্রীয় আদেশ পালন করিলেন। ইহা শুনিয়া বিরহকৃশা সীতার হৃদয়ও আশ্বস্ত হইল।

পঞ্চদশ সর্গ। এই সর্গে লবণদৈত্যবধ, কুশ ও লবের জন্ম, বাল্মীকির নিকট তাহাদের রামায়ণ শিক্ষা, রামচন্দ্রের যজ্ঞস্থলে বাল্মীকির গমন, কুশলবের রামায়ণগান, তাহাদের পরিচয়, বাল্মীকি কর্ত্তৃক সীতাগ্রহণের প্রস্তাব উত্থাপন, সভাস্থলে সীতাকে আনয়ন, পুনরায় পরীক্ষা গ্রহণের প্রস্তাব, সীতার পাতাল প্রবেশ বর্ণিত হইয়াছে। অতঃপর লক্ষ্মণবর্জ্জন ও রামচন্দ্রের স্বর্গগমন ও রামচরিত বর্ণন সমাপ্ত হইয়াছে।

এই সর্গে করুণরসের আধিক্য থাকায় বর্ণিত বিষয় বিশেষরূপ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। রামচন্দ্রের মৃত্যুর সহিত অযোধ্যাপুরীও শ্রীহীনা হইল। রামচন্দ্র কুশকে কুশাবতী ও লবকে শরাবতী নগরে স্থাপিত করিয়াছিলেন। এস্থলে অযোধ্যার ধ্বংস এই সময়ে হইয়াছিল বুঝিতে পারা যাইতেছে। কিন্তু অযোধ্যা-ধ্বংসের কোন ঐতিহাসিক কারণ উল্লিখিত হয় নাই। কাল-পুরুষের আগমন ও লক্ষ্মণবর্জ্জনের সহিত কোন ঐতিহাসিক ঘটনার সংস্রব আছে কিনা তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা অসম্ভব। তবে অযোধ্যার ধ্বংস ও রামচন্দ্রের উত্তরাভিমুখে গমন ও সরযূ-সলিলে দেহত্যাগ দেখিয়া অনুমান হয় যে সময় কোনরূপ বিপ্লব উপস্থিত হইয়া থাকিবে। পরবর্ত্তী সর্গের বর্ণনায় ইহার আভাস পাওয়া যায়।

ষোড়শ সর্গ—মহারাজ কুশ কুশাবতীতে রাজত্ব করিতেছেন। অযোধ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী রাত্রিকালে তাঁহার নিকট আবির্ভূতা

হইয়া অযোধ্যার দুরবস্থা বর্ণন করিলেন এবং তাঁহাকে পৈতৃক রাজধানীতে প্রতিগমন করিতে অনুরোধ করিলেন। সভায় ব্রাহ্মণ ও মন্ত্রীগণের নিকট এই স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিলে তাঁহারা কুশকে অযোধ্যাগমনে উৎসাহিত করিলেন, কুশও অযোধ্যায় গমন করিয়া তথায় রাজ্যপাটস্থাপন করিলেন। এক দিন সরযূনদীতে পুরাঙ্গনাগণের সহিত জলবিহারকালে তাঁহার হস্তস্থিত পিতৃদত্ত আভরণ স্খলিত হইল। কুমুদ নামক নাগরাজের ভগিনী এই আভরণ গ্রহণ করিয়াছিল। নাগরাজ কুমুদ সেই আভরণসহ ভগিনীকে কুশের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

ইহা হইতে অনুমান হয় অযোধ্যা শত্রুহস্তে পতিতা হইয়াছিল। কুশ নাগকন্যা বিবাহ করিয়া অযোধ্যার পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। কুশাবতীর নির্দ্দেশ অনুসারে তাহা গঙ্গার দক্ষিণতীরে বহুদূরে অবস্থিত ছিল। অযোধ্যা শত্রুহস্তগতা না হইলে কুশকে এতদূর যাইয়া রাজধানী স্থাপন করিতে হইত না। নাগকন্যা বিবাহেরও অন্য কারণ দেখা যায় না। আমরা যাহা বলিলাম ইহা অনুমান মাত্র। ইতিহাসবিৎ পণ্ডিতগণের মনোযোগ আকর্ষণের জন্যই এই বিষয় উল্লিখিত হইল।

এই সর্গে অযোধ্যার ভগ্নদশার যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহার তুলনা হয় না। কালিদাস অযোধ্যা দেখিয়া করুণ হৃদয়ে এই চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন মনে হয়। নহিলে এরূপ সহৃদয়তার পরিচয় সম্ভব নহে। এরূপ মনোহারিণী বর্ণনা সংস্কৃত ভাষায় আর নাই।

সপ্তদশ সর্গ—নাগকন্যা কুমুদ্বতীর গর্ভে কুশের ঔরসে অতিথির জন্ম ও দৈত্যযুদ্ধে কুশের নিধন বর্ণিত হইয়াছে। অনন্তর অতিথির রাজ্যাভিষেক ও রাজ্যশাসন উল্লিখিত হইয়াছে।

অষ্টাদশ সর্গ—শত্রুবিজয়ী অতিথি নিষধ নামক পুত্রকে রাজ্য-ভার দান করিয়া স্বর্গগমন করিলেন। নিষধের পুত্র নল পিতা পরলোক গমন করিলে রাজা হইলেন। তিনি স্বপুত্র "নভঃ"কে রাজ্যভার দিয়া যোগমার্গ অবলম্বন করিলেন। নভঃ স্বর্গগত হইলে তৎপুত্র "পুণ্ডরীক" রাজা হইলেন। তিনি যথাকালে স্বপুত্র ক্ষেমধন্বাকে রাজ্যভার প্রদান করিয়া বনগমন করিলেন। তৎপুত্র দেবানীক। তৎপুত্র অহীনগু। অহীনগুর পুত্র পারিযাত্র তৎপরে রাজা হইলেন। তৎপুত্র শিল। তৎপুত্র উন্নাভ। তৎপুত্র বজ্রনাভ। তৎপুত্র শঙ্খণ। তৎপুত্র ব্যুষিতাশ্ব। তৎপুত্র বিশ্বসহ। তৎপুত্র হিরণ্যনাভ। তৎপুত্র কৌশল্য। তৎপুত্র ব্রহ্মিষ্ঠ। তৎপুত্র পুত্র। পুত্রের পুষ্য নামে সন্তান জন্মিলে তিনি যোগশিক্ষার জন্য জৈমিনির নিকট গমন করিলেন এবং তদনন্তর মোক্ষলাভ করেন। তৎপুত্র ধ্রুবসন্ধি। মৃগয়ায় গমন করিয়া রাজা ধ্রুবসন্ধি সিংহ-কর্তৃক নিহত হইলে মন্ত্রীগণ তাঁহার "সুদর্শন" নামক শিশুপুত্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন। সুদর্শন অনেক গুণের আধার ছিলেন।

ঊনবিংশ সর্গ। রাজা সুদর্শন শেষ বয়সে নিজ পুত্র অগ্নি-বর্ণকে রাজ্য প্রদান করিয়া নৈমিষারণ্যে যোগসাধনায় গমন করিলেন, অগ্নিবর্ণ কতিপয় বৎসর নিজ কুলোচিত প্রজাপালন-কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। পরে মন্ত্রীগণের হস্তে রাজ্যশাসন ক্ষমতা প্রদান করিয়া নিজে ইন্দ্রিয়সেবায় নিরত হইলেন। তিনি দিবারাত্র অন্তঃপুরেই অতিবাহিত করিতেন। বৃদ্ধ মন্ত্রীগণের অনুরোধে দর্শনোৎসুক প্রজাগণকে দেখা দিতে হইলে অগ্নিবর্ণ গবাক্ষপথে নিজ চরণমাত্র দেখাইতেন। সতত কামিনীগণের

সহিত জলবিহার, বনবিহার ও মদ্যপান করিয়া অগ্নিবর্ণ শীঘ্রই রাজযক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইলেন। তিনি বৈদ্যগণের অবাধ্য হইয়া স্ত্রী ও সুরা পরিত্যাগ করিলেন না। অচিরে তাঁহার মৃত্যু ঘটিল। তাঁহার প্রধানা মহিষী তখন গর্ভবতী ছিলেন। তিনিই মন্ত্রীগণের সহিত রাজকার্য্য চালাইতে লাগিলেন। এই-খানে রঘুবংশের সমাপ্তি হইল।

রাজা দিলীপ, রঘু প্রভৃতি রামচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে, অগ্নিবর্ণ উচ্ছৃঙ্খল ও বাসনাসক্ত হওয়ায় বংশের একপ্রকার লোপ ঘটিল। এক এক বংশের আদি-পুরুষগণ কিরূপ ত্যাগী, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও রাজনীতিকুশল হইয়া থাকেন, অধস্তনপুরুষ কিরূপ ভোগাভিলাষী ও কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়েন তাহা ইহা হইতে বুঝা যায়। এই সকল কারণে বংশনাশ ও রাজ্যনাশ হইয়া থাকে।

কালিদাসও অতিমাত্র নিপুণতার সহিত অগ্নিবর্ণের চরিত্র অঙ্কিত করিয়া এইখানে রঘুবংশের সমাপ্তি করিয়াছেন। কেননা পূর্ব্বের ন্যায় গুণসম্পন্ন রাজগণ তৎপরে আর রঘুকুল উজ্জ্বল করেন নাই।

রঘুকুলের আলোচনা করিয়া স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে কালিদাস রামায়ণ অথবা কোন পুরাণের অনুসরণ করেন নাই। বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত, অগ্নি, মৎস্য ও বায়ুপুরাণে রাজগণের বংশতালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে বিষ্ণু ও ভাগবত পুরাণের মত বিশেষ মান্য। কিন্তু কালিদাস রঘুবংশীয় রাজগণের নামোল্লেখকালে বিষ্ণু ও ভাগবতের মত যথাযথ গ্রহণ করেন নাই। পুরাণে নাই এরূপ কয়েকটী নাম তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। এবং পুরাণে যাহা দৃষ্ট

হয় এরূপ দুই একটী নাম তিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে কালিদাসের সময় এসকল সংগ্রহ করিবার অন্য উপকরণ বিদ্যমান ছিল। রাজতরঙ্গিণীকারও অনেকানেক গ্রন্থ হইতে কাশ্মীরের রাজবংশতালিকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন এরূপ লিখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং এখন আমরা পুরাণগুলি যেরূপ আকারে দেখিতে পাই পূর্ব্বে সেগুলির সেরূপ আকার নিশ্চয়ই ছিল না। বিষ্ণুপুরাণে "অত্রোচ্যতে", "অত্র-গীয়তে" বলিয়া যে সকল শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায় সেগুলি যে প্রাচীন গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং আজকাল যে সকল পুরাণ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থ তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। নিরপেক্ষভাবে বিবেচনা করিলে দৃঢ় প্রতীতি জন্মে এখনকার প্রচলিত পুরাণগুলি কালিদাসের পরবর্ত্তী সময়ে লিখিত। আরও প্রতীতি জন্মিবে কালিদাস যখন পৌরাণিক বংশতালিকা গ্রহণ করেন নাই তখন তিনি যে শিবপুরাণ বা পদ্মপুরাণ হইতে আখ্যায়িকা গ্রহণ করিবেন তাহাও অসম্ভব। তাঁহার সময়ে এখনকার প্রচলিত পুরাণগুলির অস্তিত্ব ছিল কিনা সন্দেহ। পদ্মপুরাণের আধুনিকত্ব যথাস্থানে প্রদর্শিত হইবে।

যে সকল রাজগণের চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে বিশেষতঃ রামায়ণের পরবর্ত্তী সময়ে যাঁহারা বিদ্যমান ছিলেন তাঁহাদের নামোল্লেখ ভিন্ন পুরাণে অন্য কোন ঘটনার উল্লেখ নাই। কালিদাসও যে নিজের কল্পনাবলেই অগ্নিবর্ণ প্রভৃতি নৃপতিগণের চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন তাহা নহে। কালিদাসের সময় সূর্য্যবংশীয় নৃপতিগণ ভারতের নানাস্থানে রাজত্ব করিতেছিলেন। তখন রাজ-

সভায় দৈনিক ঘটনা লিপিবদ্ধ করিবার জন্য কর্ম্মচারী থাকিত। এবং প্রধান প্রধান ঘটনা সমুদয় সূর্য্যবংশীয় রাজগণের কণ্ঠস্থ থাকিত। এখনও কুশের বংশধর উদয়পুরের মহারাণাগণ নিজ নিজ বংশাবলী যত্নের সহিত কণ্ঠস্থ করেন। মহারাণা ভীমসিংহের নিজ পূর্ব্বপুরুষগণের কার্য্যকলাপ কণ্ঠস্থ ছিল। আমাদের দেশেও নিজ বংশ পরিচয় ও পূর্ব্বপুরুষগণের নাম যথারীতি স্মরণ রাখিতে বালকগণ শিক্ষিত হইয়া থাকে।

সম্ভবতঃ রাজগণের পুস্তকালয় হইতে অথবা ঐরূপ উপায়ে কালিদাস কুশ ও তৎপরবর্ত্তী রাজগণের বংশতালিকা ও ঘটনাবলী সংগ্রহ করিয়াছিলেন। নহিলে দৈত্যযুদ্ধে কুশের নিধন, সিংহ কর্ত্তৃক ধ্রুবসন্ধির বিনাশ ও অগ্নিবর্ণের কামিনীগণের সহিত অন্তঃ-পুরে অবস্থান কালিদাস কোথায় পাইবেন। সার্ডনাপলাশভাবে অগ্নিবর্ণকে উপস্থিত করায় কালিদাসের কোন স্বার্থ থাকিতে পারে না। এইজন্য মনে হয় আমাদের সময়ে যে সকল পুরাণ দেখা যায় তাহা কালিদাস অবলম্বন করেন নাই।

অভিজ্ঞান শকুন্তল।

ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতগণের মতে "কালিদাসস্য সর্ব্বস্ব অভিজ্ঞান-শকুন্তলং"। কিন্তু অভিজ্ঞান শকুন্তল কেবল কালিদাসের জীবন-সর্ব্বস্ব নহে। ইহা আর্য্য কবিপ্রতিভার উজ্জ্বল কীর্ত্তিস্তম্ভ। ভারতবাসীমাত্রেরই গৌরবের সামগ্রী এবং সংস্কৃত সাহিত্য-ভাণ্ডারের অমূল্য রত্ন। অভিজ্ঞান শকুন্তল হইতে আমরা জগতে

ধন্য হইয়াছি। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের সংস্কৃত চর্চ্চা ও শব্দবিদ্যার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিলাভ অভিজ্ঞান শকুন্তলের জন্য হইয়াছে বলিতে হইবে।

অতি শুভক্ষণে বঙ্গদেশে ইংরাজ আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছিল। অতি শুভক্ষণে সার উইলিয়ম জোন্স এদেশে আসিয়াছিলেন। এবং অতি শুভক্ষণে তিনি এসিয়াটিক সোসাইটীর প্রতিষ্ঠা করিয়া সংস্কৃত চর্চ্চা আরম্ভ করিয়াছিলেন। এবং অতি শুভক্ষণেই তিনি অভিজ্ঞান শকুন্তলের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার ইংরাজী অনুবাদের কষ্টকৃত জর্ম্মণ অনুবাদ পাঠ করিয়া অদ্বিতীয় ভাবুক ও কবি গেটে লিখিয়াছেন "যদি কেহ বসন্তের পুষ্প ও শরদের ফললাভের অভিলাষ করে, যদি কেহ চিত্তের আকর্ষক ও বশীকরণকারী বস্তুর অভিলাষ করে, যদি কেহ প্রীতিজনক ও প্রফুল্লকর বস্তুর অভিলাষ করে, যদি কেহ স্বর্গ ও পৃথিবী এক নামে সমাবেশিত দেখিবার অভিলাষ করে, তাহা হইলে হে অভিজ্ঞান শকুন্তল আমি তোমারই নাম নির্দ্দেশ করি এবং তাহা হইলেই সকল বলা হইল।" পণ্ডিতবর হার্ডার এবং স্লেগেলও গেটের ন্যায় অভিজ্ঞান শকুন্তলের অশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।

অভিজ্ঞান শকুন্তলের ইংরাজী অনুবাদ হইতে য়ুরোপীয় যাবতীয় ভাষায় অনুবাদ হইয়াছে। য়ুরোপীয় শব্দবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতগণ সংস্কৃত চর্চ্চায় মনোযোগী হইয়া লুপ্তপ্রায় অনেকানেক গ্রন্থের উদ্ধার সাধন করিয়াছেন। এবং সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন হইতে তাঁহারা পৃথিবীস্থ যাবতীয় ভাষার মূলনির্ণয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। এবং ইহা হইতে মানব জাতির শ্রেণীবিভাগ, আদি-

বাসস্থান নির্ণয় ও বহু পুরাতন কালের আচার ব্যবহার অবধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। মানবীয় জ্ঞানের এতদূর উন্নতি কেবলমাত্র অভিজ্ঞান শকুন্তলের জোন্সকৃত অনুবাদ হইতে হইয়াছে বলিতে হইবে।

বিদেশে অভিজ্ঞান শকুন্তল যেরূপ আদৃত হইয়াছে দেশেও পূর্ব্বাপর ইহার ততোধিক আদর ছিল। কালিদাসকৃত মহা-কাব্যগুলি ভারতীয় পণ্ডিতগণের নিকট তাদৃশ আদৃত না হইলেও অভিজ্ঞান শকুন্তল চিরদিনই সমান আদর পাইয়া আসিতেছে। সকলেই ইহাকে সংস্কৃত ভাষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। স্বীকার না করিবেনই বা কিরূপে? এই নাটকে কালিদাস যেরূপ অসাধারণ সৃষ্টিক্ষমতা, অদ্ভুত রচনা কৌশল দেখাইয়াছেন, বর্ণনাশক্তি ও চরিত্রাঙ্কন ক্ষমতা তদপেক্ষা অধিক দেখাইয়াছেন। কালিদাসের কবিত্বশক্তির পূর্ণবিকাশ অভিজ্ঞান শকুন্তলের প্রত্যেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। কবি নিজেও বুঝিয়াছিলেন তিনি কিরূপ অপার্থিব বস্তুর সৃষ্টি করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। সেইজন্য দুষ্মন্তের মুখ দিয়া শকুন্তলাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন

অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিশলয়মলূনং কররুহৈ-
রনাবিদ্ধং রত্নং মধুনবমনাস্বাদিতপূর্ব্বরসং।
অখণ্ডং পুণ্যানাং ফলমিব চ তদ্রূপমনঘং
ন জানে ভোক্তারং কমিহ সমুপস্থাস্যতি বিধিঃ ॥

এই অনাঘ্রাত পুষ্প, নখাঘাতে অছিন্ন কিশলয়, অবিদ্ধরত্ন, অনা-স্বাদিত নবমধু, অখণ্ডপুণ্যের ফলের ন্যায় দোষস্পর্শশূন্য পদার্থের ভোক্তা বিধি কাহাকে করিবেন কে জানে?

বস্তুতঃ এই পুষ্পের প্রকৃত আঘ্রাণ কয়জন পাইয়াছেন? এই নব মধু প্রকৃতরূপে আস্বাদ করিতে কয়জন সমর্থ হইয়াছেন? এই অবিদ্ধরত্ন চিনিতে কয়জন কৃতকার্য্য হইয়াছেন? যিনি যেরূপ ভাবুক হউন না কেন, অভিজ্ঞান শকুন্তল তাঁহার চিত্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ। বালক বৃদ্ধ, যুবতী সকলেই সমান আনন্দ ও তৃপ্তিলাভ করিবেন।

মহাভারতের আদিপর্ব্বে শকুন্তলা উপখ্যান আছে। পদ্ম-পুরাণেও উক্ত উপাখ্যান দেখা যায়। এক্ষণে কোন্ উপাখ্যান কালিদাস অবলম্বন করিয়াছেন তাহার সংক্ষেপে আলোচনা করা যাউক। মহাভারতে দেখা যায়—"হস্তিনাধিপতি রাজা দুষ্মন্ত মৃগয়া করিতে গমন করেন। নানা মৃগ ও পক্ষী বধ করিতে করিতে বন হইতে বনান্তরে বিচরণ করিয়া অবশেষে তিনি কণ্ব-মুনির আশ্রমে উপনীত হন। মহর্ষি কণ্ব তখন আশ্রমে ছিলেন না, তাঁহার পালিততনয়া শকুন্তলা অতিথি আগত দেখিয়া রাজার অভ্যর্থনা করিলেন। শকুন্তলার রূপে ও গুণে মুগ্ধ হইয়া রাজা তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। শকুন্তলা বিশ্বামিত্রের ঔরসে মেনকা নাম্নী অপ্সরার গর্ভে জন্মিয়াছিলেন। কণ্ব তাঁহাকে পরিত্যক্ত অবস্থায় বনে কুড়াইয়া পাইয়া কন্যার ন্যায় প্রতিপালন করিয়াছিলেন। এইরূপ আত্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করিলে রাজা গান্ধর্ব্ববিধানে শকুন্তলার পাণিগ্রহণে অভিলাষী হইলেন। শকুন্তলা রাজাকে সত্যপাশে বদ্ধ করিয়া লইলেন যে, তাঁহার যে কুমার জন্মিবে সেই যুবরাজ হইয়া রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইবে। রাজা উক্ত প্রকার সত্যে আবদ্ধ হইয়া শকুন্তলাকে গান্ধর্ব্ব বিধানে বিবাহ করিলেন। এবং রাজধানীতে প্রত্যাগমন

করিলেন। শকুন্তলা পিতার আশ্রমে রহিলেন। ক্রমে: তাঁহার পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল। মহর্ষি কণ্ব শকুন্তলার বিবাহে অসন্তুষ্ট হন নাই। বরং প্রীত হইয়াছিলেন। শকুন্তলার পুত্রের শিক্ষালাভের সময় উপস্থিত হইলে তিনি সপুত্রা শকুন্তলাকে রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন। রাজা শকুন্তলাকে দেখিয়া লোকাপবাদ ভয়ে তাঁহাকে গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত হইলেন এবং এরূপ ভাব দেখাইলেন যেন তিনি শকুন্তলাকে কোন কালে দেখেন নাই বা বিবাহ করেন নাই। শকুন্তলা রাজাকে অনেক তিরস্কার করিলেন। ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন তথাপি মন নরম হইল না। অবশেষে দৈববাণী হইল যে যথার্থ ই শকুন্তলা রাজার পরিণীতা ভার্য্যা এবং তৎপুত্র রাজচক্রবর্ত্তী হইয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিবেন। তথন দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে গ্রহণ করিলেন এবং যথাযথ পরিণয়ব্যাপারের পরিচয় দিলেন।”

পদ্মপুরাণের উপাখ্যান অন্যরূপ। রাজা মৃগয়া করিতে গমন করিয়া একটী মৃগ দেখিলেন। তাহার অনুসরণ করিয়া কণ্বাশ্রমের সমীপবর্ত্তী হইলেন। যেমন মৃগকে লক্ষ্য করিয়া শরত্যাগ করিবেন অমনই কণ্বশিষ্যগণ “আশ্রম মৃগ মারিবেন না” বলিয়া তাঁহাকে নিষেধ করিলেন। অনন্তর রাজা তৃষাতুর হইয়া জলান্বেষণ করিতে-ছেন এমন সময়ে ঘট লইয়া আশ্রমবৃক্ষে জলসিঞ্চনকারিণী কয়েকটী ঋষিকন্যা দেখিলেন। তাহাদের মধ্যে শকুন্তলা রাজাকে দেখিয়া পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া অতিথিসৎকারের ব্যবস্থা করিলেন। রাজা কাম-পীড়িত হইয়া শকুন্তলার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাঁহার সখীর নিকট সমস্ত অবগত হইলেন। তথন গান্ধর্ব্বমতে রাজা তাঁহাকে বিবাহ করিতে অভিলাষী হইলে শকুন্তলা তাঁহাকে ঋষির

প্রত্যাগমনকালপর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। রাজা প্রবোধ মানিলেন না। তিনি গান্ধর্ব্ব বিবাহের শ্রেষ্ঠতা বুঝাইয়া শকুন্তলাকে আত্মদানে সম্মতা করিলেন। কিন্তু শকুন্তলা রাজাকে সত্যপাশে বদ্ধ করিলেন যে তাঁহার গর্ভস্থ পুত্র যুবরাজ হইবে। তৎপরে নিদর্শনস্বরূপ রাজার হস্তস্থ অঙ্গুরীয়ক চাহিয়া লইলেন। অনন্তর গান্ধর্ব্ব মতে উভয়ের বিবাহ হইল। রাজা শীঘ্রই শকুন্তলাকে রাজধানীতে লইয়া যাইবেন এরূপ আশা দিয়া রাজধানী গমন করিলেন। কিন্তু কণ্ব শুনিয়া কি বলিবেন ইহা ভাবিয়া নিতান্ত উৎকলিকাকুল হইলেন। কণ্ব আশ্রমে আসিয়া শকুন্তলার বিবাহে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। অতঃপর আশ্রম হইতে কণ্বের অনুপস্থিতি সময়ে দুর্ব্বাসা ঋষি আসিয়া অতিথি হইলেন। শকুন্তলা অনন্যমনে রাজার বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন, অতিথির আগমন জানিতে পারেন নাই। দুর্ব্বাসা ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ দিলেন " তুমি যাহার চিন্তা করিতেছ তোমাকে সে বিস্মৃত হইবে।" শকুন্তলা তাহাও জানিতে পারিলেন না। তাঁহার সখী প্রিয়ংবদা ইহা জানিতে পারিয়া অনেক স্তবস্তুতিদ্বারা দুর্ব্বাসার ক্রোধশান্তি করিলে তিনি বলিলেন "অভিজ্ঞান দর্শন করিলে রাজা শকুন্তলাকে স্মরণ করিবেন," কিন্তু শকুন্তলা এ বিষয় বিন্দুমাত্রও জানিতে পারিলেন না।

শকুন্তলার গর্ভাবস্থা দেখিয়া কণ্বমুনি তাঁহাকে রাজসকাশে প্রেরণ করিতে অভিলাষী হইলেন। নিজ শিষ্য দুইজন ও আর্য্যা গৌতমী এবং শকুন্তলার সখী প্রিয়ংবদাকে সঙ্গে দিয়া মহর্ষি কণ্ব শকুন্তলাকে রাজধানী পাঠাইলেন। পথে সরস্বতী নদীতে স্নান করিবার সময় প্রিয়ংবদার হস্ত হইতে রাজদত্ত অঙ্গুরীয়ক জলে পড়িয়া

গেল। প্রিয়ংবদা সে কথা শকুন্তলাকে বলিতে সাহসী হইলেন না। শকুন্তলাও সে কথা জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গেলেন। অনন্তর যথাসময়ে সকলে রাজভবনে উপস্থিত হইলেন। দ্বারী রাজাকে সংবাদ জানাইল। রাজা পুরোহিতকে আগন্তুক-দিগের আগমনকারণ জানিবার জন্য পাঠাইলেন। পুরোহিত যথাদিষ্ট কার্য্য করিলেন। রাজা সমস্ত বিস্মৃত হইয়াছেন। তথাপি পুরোহিতের কথায়, শকুন্তলা ও তাঁহার সঙ্গীগণকে সভায় প্রবেশ করিবার অনুমতি দিলেন, রাজা কণ্বশিষ্যগণের কথায় বিশ্বাস করিলেন না। শকুন্তলাকে বেশ্যা মনে করিলেন। শকুন্তলা অভিজ্ঞান দেখাইতে চাহিলে প্রিয়ংবদা বলিলেন, অঙ্গুরীয়ক জলে পড়িয়া গিয়াছে। তখন বাতাহত কদলীর ন্যায় শকুন্তলা ভূপতিতা হইলেন। সংজ্ঞালাভ করিয়া রাজাকে ধর্ম্মাধর্ম্মসম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। শকুন্তলা প্রত্যাখ্যাতা হইয়া পুরোহিতের গৃহে গমন করিতেছেন এমন সময় মেনকা আসিয়া তাঁহাকে লইয়া গেলেন।

অনন্তর ধীবরের নিকট অঙ্গুরীয়ক দেখিয়া রাজার সমস্ত বৃত্তান্ত মনে পড়িল। শকুন্তলার বিরহে তিনি নিতান্ত খিদ্যমান হইলেন। অনন্তর ইন্দ্রসারথি মাতলি আসিয়া দেবকার্য্যসাধনের জন্য দুষ্মন্তকে লইয়া গেলেন। প্রত্যাগমনকালে তাঁহাকে মারীচাশ্রমে আনিলে তথায় রাজা শকুন্তলার সহিত নিজপুত্র প্রাপ্ত হইলেন।

পদ্মপুরাণে বর্ণিত শকুন্তলোপাখ্যানের সহিত নাটকীয় গল্পাংশের সম্পূর্ণ মিল দেখা যায়। কেবল গল্পাংশ বলিয়া নহে, ভাষা ও ভাবের অনেক সাদৃশ্য আছে। নামগুলিও এক। ইহাতে কেহ কেহ অনুমান করেন পদ্মপুরাণ হইতে কালিদাস উপাখ্যানভাগ

গ্রহণ করিয়াছেন। "শকুন্তলা রহস্য" প্রণেতা ইহা প্রতিপন্ন করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু পদ্মপুরাণ যে আধুনিক গ্রন্থ তাহা প্রমাণ করিতে বিশেষ কষ্ট করিতে হইবে না। পদ্মপুরাণের অন্তর্গত ক্রিয়াযোগসারে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটী দেখা যায়—

তস্মিন ক্ষেত্রবরে পুণ্যে সর্ব্বকামফলপ্রদে।
ভবেদ্রাজা সুষেণাখ্য সোমবংশসমুদ্ভবঃ॥

উক্ত শ্লোকে বঙ্গদেশের চন্দ্রবংশীয় সুষেণ রাজার উল্লেখ আছে। রাজা সুষেণ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর লোক সুতরাং পদ্মপুরাণ যে তাঁহার সময়ে বা পরে রচিত হইয়াছিল তাহা প্রমাণিত হইতেছে। কুমারসম্ভব ও রঘুবংশের আলোচনার সময় পুরাণগুলির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য তাহা বলিয়াছি। এক্ষণে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। যিনি পদ্মপুরাণের শকুন্তলা বৃত্তান্ত পাঠ করিবেন তিনি বুঝিবেন যে উক্ত উপাখ্যানরচয়িতা মহাভারতোক্ত উপাখ্যানের সম্পূর্ণ অনুসরণ করেন নাই। মহাভারত ও অভিজ্ঞানশকুন্তল হইতে তিনি ভাব সঙ্কলন করিয়াছেন।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন কালিদাস অভিজ্ঞানশকুন্তলের উপাখ্যানভাগ মহাভারত ও নিদর্শনের অদর্শন সম্বন্ধে প্রচলিত কোন উপাখ্যান হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। এ বিষয়ে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। এ মত যুক্তিযুক্ত হইলেও বলিতে হইবে। দুর্ব্বাসার অভিশাপ কালিদাসের নিজ সৃষ্টি। মহাভারতে দুর্ব্বাসার অভিশাপের উল্লেখ নাই। পদ্মপুরাণের শকুন্তলা এত সাবধান যে পুত্র হইলে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবে রাজাকে সত্যপাশে আবদ্ধ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, আবার নিদর্শনস্বরূপ অঙ্গুরীয়ক চাহিয়া লইলেন। তাহা হইতে বুঝা যায় যেন অঙ্গুরীয়কচ্যুতি বা অন্ত

কোন কারণ ঘটিবে। উপাখ্যানকারের সতর্কতা অবলম্বন দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে নিদর্শনগ্রহণে তাঁহার গূঢ় অভিসন্ধি রহিল। কিন্তু অভিজ্ঞান শকুন্তলে সেরূপ লক্ষিত হয় না। শকুন্তলা নিদর্শন চাহিয়া লন নাই। রাজা অনুরাগের চিহ্নস্বরূপ নিজ নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক শকুন্তলাকে উপহার দিয়াছিলেন, এ কথা আমরা শকুন্তলার সখীর কথায় জানিতে পারি। শকুন্তলা ও রাজার মিলনসময়ে এ কথার উল্লেখ নাই।

প্রথমাঙ্ক।—সংস্কৃত নাটকের প্রথমে নান্দী অর্থাৎ মঙ্গলাচরণ ও পরে প্রস্তাবনা থাকে। প্রস্তাবনায় সূত্রধার কর্তৃক কবির পরিচয় ও নাটকীয় ইতিবৃত্ত উল্লিখিত হইয়া থাকে। অভিজ্ঞানশকুন্তলেও প্রচলিত নীতি অনুসৃত হইয়াছে। কবি সূত্রধারমুখে নিজ স্বভাবসিদ্ধ বিনয়ের পরিচয় দিয়াছেন।

আপরিতোষাদ্ বিদুষাং ন সাধুমন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানং।
বলবদপি শিক্ষিতানামাত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতাঃ॥

এরূপ আত্মশক্তিতে অবিশ্বাস কালিদাসের ন্যায় কবির উপযুক্ত বটে। অতঃপর নাটকীয় ইতিবৃত্তের উল্লেখ করিয়া অর্থাৎ রাজা দুষ্মন্ত যে মৃগানুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহা বলিয়া সূত্রধারের কার্য্য শেষ হইল এবং নাটকের প্রকৃত অভিনয়ারম্ভ হইল।

অনন্তর রথারূঢ় শরবস্ত রাজা দুষ্মন্ত প্রবেশ করিলেন। পূর্ব্বকালে রথ লইয়া প্রবেশ করা যাইত। বর্তমানকালে অযোধ্যা-প্রদেশে রামলীলার সময় যেরূপ রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মিত হয় পূর্ব্বকালে সম্ভবতঃ কতকটা সেইরূপ হইত। উক্ত প্রকার রঙ্গভূমিতে রথ বা শকট লইয়া প্রবেশের কোনরূপ বাধা দেখা যায় না। রাজা দুষ্মন্ত কৃষ্ণসার মৃগের অনুসরণ করিয়া শরনিক্ষেপের অবসর

অন্বেষণ করিতেছেন। মৃগের দ্রুতগতিবশতঃ তাঁহার সন্নিহিত হইতে না পারিয়া সারথিকে অতিবেগে রথ চালাইবার আদেশ করিতেছেন। বনস্থলীর ভূমি সমতল নহে। এজন্য রথ বেগে চলিতে পারিতেছে না। পরে সমতল ভূমি পাইয়া অশ্বগণ সারথির উত্তেজনায় রথ লইয়া ছুটিতেছে। রথের অতিবেগে গমনবশতঃ পূর্ব্বে রাজার চক্ষে যাহা সূক্ষ্ম দেখাইতেছিল, এক্ষণে তাহা বৃহদায়তন দেখাইতেছে। যে সমস্ত বস্তু অন্তর্বিচ্ছিন্ন বোধ হইতেছিল তাহা যেন সম্মিলিত দেখাইতেছে। স্বভাবতঃ যাহা বক্র তাহাও সরল দেখাইতেছে। রাজার বোধ হইতেছে যেন কিছুক্ষণের জন্য তাঁহার পার্শ্বে বা দূরে কোন বস্তুই থাকিতেছে না (সমস্তই যেন সরিয়া যাইতেছে বলিয়া বোধ হইতেছে)।

বাষ্পীয়যানে গমনকালে এরূপ দৃশ্য প্রত্যক্ষীভূত হয়। কবির সময়ে রথ বা নৌকায় গমনকালে কতকটা এরূপ দৃশ্য দেখা অসম্ভব নহে। কিন্তু কালিদাস তাঁহার ত্রিকালব্যাপিনী প্রতিভা বলে বর্ত্তমানকালের প্রত্যক্ষীভূত বিষয় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কল্পনার চক্ষে দেখিয়াছিলেন।

অতঃপর মৃগের সমীপবর্ত্তী হইয়া রাজা শরনিক্ষেপ করিতে যাইবেন, এমন সময়ে ঋষিগণ বলিলেন "মহারাজ, ওটী আশ্রমমৃগ মারিবেন না।" ধার্ম্মিকচূড়ামণি রাজা ঐ কথা শুনিয়া আর শরত্যাগ করিলেন না। ঋষিগণের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া রাজা তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ লাভ করিলেন, এবং তাঁহাদের উপদেশমতে কুলপতি কণ্বের আশ্রমে আতিথ্যগ্রহণে অভিলাষী হইলেন। যদিও মহর্ষি তখন উপস্থিত ছিলেন না তথাপি তপোবনে আগমন করিয়া তাঁহার আশ্রম দর্শন না করিলে তাঁহার

প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শিত হয় না। মহর্ষি প্রত্যাগত হইয়া ক্ষুণ্ণ হইতে পারেন,' এজন্য মহর্ষি কণ্বের প্রতি ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন অবশ্যকর্ত্তব্য মনে করিয়া রাজা তদভিমুখে যাইতে লাগিলেন। সারথিকে অশ্বগণের সেবা করিতে বলিয়া বিনীতবেশে পদব্রজে তপোবনে প্রবেশ করিলেন।

তপোবনের পশু পক্ষী বিশ্বস্তভাবে বিচরণ করিতেছে। মৃগগণ রথশব্দে ভীত হইল না। পলায়নও করিল না। আশ্রমবৃক্ষের কোটরস্থ শুকপক্ষীর মুখভ্রষ্ট ধান্যতৃণাদি তরুতলে ইতস্ততঃ বিকীর্ণ রহিয়াছে। যে সকল শিলাখণ্ডদ্বারা তৈলগর্ভ ইঙ্গুদী ফল ভগ্ন হইয়াছে তাহাও বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। নগরবাসে চিরাভ্যস্ত রাজা তপোবনের এই শোভা দেখিয়া মনে বিমল আনন্দ অনুভব করিলেন। তপোবন তাঁহার নিকট শান্তিনিকেতন বোধ হইতে লাগিল। এমন সময়ে তাঁহার দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হইতে লাগিল। স্ত্রীলোকের বামাঙ্গ ও পুরুষের দক্ষিণাঙ্গ স্পন্দন শুভসূচক। পুরুষের ইহা স্ত্রীলাভের চিহ্ন। ইহাই প্রচলিত বিশ্বাস। গ্রন্থাদিতেও এরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। রাজাও এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইলেন এবং তপোবনে কিরূপে স্ত্রীলাভ সম্ভব তাহার মীমাংসা করিতে না পারিয়া অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিলেন।

ভবিতব্যের উপর নির্ভর করিয়া রাজা আশ্রমের দিকে অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময়ে তিনি বৃক্ষবীথিকার মধ্য হইতে দেখিলেন ঋষিকন্যাগণ নিজ নিজ সামর্থ্য ও দেহের অনুরূপ কলসী লইয়া আশ্রম বৃক্ষে জল সেচন করিতেছেন। সমীপস্থ হইলে পাছে তাঁহারা অপরিচিত পুরুষের নিকট বিশ্বস্তার ন্যায় আলাপে বিরতা হন, এজন্য রাজা অন্তরালে থাকিয়া তাঁহাদের আলাপশ্রবণে অভিলাষী

হইলেন। তিনি এখন ধর্ম্মাসনস্থ রাজা নহেন। কাজেই সাধারণ জনোচিত কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া ঋষিকন্যাগণের বিশ্বস্ত আলাপ শুনিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কন্যাগণকে দর্শন করিয়াই রাজার মনে প্রীতি জন্মিয়াছিল। উদ্যানলতা যে বনলতার নিকট পরাজিত অর্থাৎ অন্তঃপুরচারিণী, নানাবস্ত্রালঙ্কারধারিণী বিলাসিনী পুরাঙ্গনা যে বনচারিণী, বল্কলধারিণী, সরলা ঋষিকন্যাগণের নিকট রূপগর্ব্বে পরাজিতা রাজা তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। স্বভাবতঃ সুন্দর পদার্থ দেখিলে নয়ন মন যেমন আপনা হইতেই সেদিকে আকৃষ্ট হয়, যেমন প্রফুল্ল কমল বা গোলাপ দেখিলে আপনা হইতে তাহার প্রশংসা করিতে ইচ্ছা করে রাজার মনেও এখন সেইভাব উপস্থিত। এই সৌন্দর্য্যদর্শন ও প্রশংসা হইতে ভোগবাসনা জন্মে। রাজার মনে সেই বাসনা কিরূপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল দেখা যাউক। ঋষিকন্যাগণের মধ্যে শকুন্তলার রূপে রাজা আকৃষ্ট হইয়াছেন। আহা সেই অনিন্দিত রূপরাশি, সেই শিরিষ-কুসুম-সুকুমার দেহ যে তপস্যাক্লেশ সহ্য করিতে বাধ্য হইবে ইহা ভাবিতেও রাজার ক্লেশ হইতেছে। ভগবান্ কণ্ব যে সম্যক্‌রূপ বিবেচনা করিয়া কাজ করেন নাই (অর্থাৎ শকুন্তলাকে তপশ্চরণে নিযুক্ত করিয়াছেন) ইহা ভাবিয়া রাজা কাশ্যপের প্রতি বিরক্ত হইতেছেন। অতঃপর শকুন্তলা কাশ্যপের কিরূপ কন্যা অর্থাৎ ঔরস কন্যা কিনা জানিবার জন্য রাজার মন ব্যগ্র হইল। এই সময় হইতেই রাজার শকুন্তলাপ্রেম অঙ্কুরিত হইতে লাগিল। তিনি শকুন্তলার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইলেও তখন একেবারে আত্মহারা হন নাই। তিনি একেবারে বিচারশূন্য নহেন। শকুন্তলা ব্রাহ্মণতনয়া হইলে তাঁহার আশালতা অঙ্কুরেই শুখাইয়া যাইবে তাহা তিনি জানেন। সুতরাং

মনকে আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিলেন "সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু প্রমাণমন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ।"

রাজা এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে তাঁহার আত্ম-প্রকাশের অবসর উপস্থিত হইল। একটী ভ্রমর শকুন্তলার মুখ-সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া তাহার চতুর্দ্দিকে উড়িতে লাগিল। শকুন্তলা ভ্রমরের অত্যাচারে নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়া সখীগণের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। সখীগণ রাজার "দোহাই" দিতে বলিল। ভারতবর্ষীয় লোকেরা অত্যাচারে পীড়িত হইলে রাজার বা প্রবল লোকের "দোহাই" দিয়া থাকেন। অন্যান্য দেশেও এরূপ প্রথা প্রচলিত আছে। শুনিতে পাওয়া যায় আরবদেশীয়গণের সহিত ভারতীয় হিন্দুগণের প্রথম সংঘর্ষ এই "দোহাই" ব্যাপার লইয়া হইয়াছিল। কোন আরবীয় জাহাজ সিন্ধুদেশীয় লোকের লুণ্ঠন করিতে গেলে জনৈক ব্যক্তি খলিপার দোহাই দিয়াছিল। তাহা না মানাতেই যুদ্ধ ঘটে।

শকুন্তলা রাজার দোহাই দিতে উপদিষ্ট হইলে রাজা আত্ম-প্রকাশের সুযোগ পাইলেন। "ন ভেতব্যং" "ন ভেতব্যং" বলিয়া তিনি ঋষিকন্যাগণের সমীপস্থ হইলেন। রাজা যেরূপ প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিয়া শকুন্তলা ও তাঁহার সখীগণের কথোপ-কথন শ্রবণ করিতেছিলেন তাহাতে যে কোনপ্রকারে তিনি তাঁহা-দের নিকট যাইতে পারিতেন ইহা সম্ভবপর নহে। এইজন্য ভ্রমরপীড়ারূপ কৌশল অবলম্বন করিয়া কবি তাঁহাদের সাক্ষাৎকার ঘটাইলেন।

রাজা ঋষিকন্যাগণের সমীপস্থ হইয়া প্রথমে শকুন্তলাকে শিষ্টা-চারসম্মত তপস্যার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু সম্ভ্রমজড়তা

হেতু শকুন্তলা তাঁহার কথার উত্তর দিতে পারিলেন না। তাঁহার সখীদ্বয় রাজার প্রতি অতিথিজনোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল।

রাজা নিজ পরিচয় গোপন করিলেন না বটে কিন্তু স্পষ্ট করিয়া বলিলেন না যে তিনিই রাজা দুষ্মন্ত। সখীদের মনে সন্দেহ হইল। অতঃপর রাজা শকুন্তলার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। এবং বিশ্বামিত্রের ঔরসে মেনকার গর্ভে তাঁহার উৎপত্তি শুনিয়া কতকটা আশ্বস্ত হইলেন। পরে যখন শুনিলেন শকুন্তলাকে বানপ্রস্থ ধর্মে নিযুক্ত রাখা ঋষি কাশ্যপের অভিপ্রেত নহে বরং অনুরূপ বরে তাঁহাকে সম্প্রদান করাই তাঁহার সঙ্কল্প তখন রাজার মন আশায় উৎফুল্ল হইল। এতক্ষণ পর্যান্ত রাজা ভাবিতেছিলেন শকুন্তলা হয়ত ব্রাহ্মণতনয়া অথবা অন্যপূর্ব্বা অর্থাৎ অন্য পাত্রে তাঁহাকে সম্প্রদানের জন্য ঋষি কাশ্যপ বাগ্‌দান করিয়া থাকিবেন। কিন্তু যখন তিনি জানিতে পারিলেন তাঁহার সন্দেহ মিথ্যা তখন তাঁহার মন সুস্থির হইল। তিনি যে সন্দেহদোলায় দুলিতেছিলেন তাহা নিবারিত হইল। রাজার মনে শকুন্তলাপ্রেম অঙ্কুরিত হইয়াছিল এক্ষণে বদ্ধমূল হইল। যখন প্রিয়ংবদা দুই ঘট জল পরিশোধের জন্য গমনোদ্যতা শকুন্তলাকে রহস্যচ্ছলে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল তখন রাজা নিজ অঙ্গুরীয় দিয়া শকুন্তলার ঋণ পরিশোধে ব্যগ্র হইলেন। রাজা যে প্রীতির চক্ষে শকুন্তলাকে দেখিয়াছেন তাহা সখীরা পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারিল। তিনি নিজের প্রকৃত পরিচয় না দিলেও প্রিয়ংবদা তাঁহাকে পূর্ব্বেই সন্দেহ করিয়াছিল।

শকুন্তলার ভাবভঙ্গী দেখিয়া রাজা বুঝিয়াছিলেন যে তিনিও তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন। শকুন্তলা রাজার কথার কোন

উত্তর না করিলেও অবহিতচিত্তে তাঁহার কথা শুনিতেছিলেন। তাঁহার মুখের দিকে না তাকাইলেও অন্য বিষয়েও তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। পরে যখন গমনকালে শকুন্তলার চরণ কুশক্ষত ও বল্কল কুরুবক শাখায় লগ্ন হইল বলিয়া তাহা উদ্ধারের ছলে শকুন্তলা রাজাকে দেখিতে লাগিলেন তখন রাজা মনে করিলেন তাঁহার আশা ফলবতী হইবে। গমনকালে প্রেমিকার পশ্চাদ্দৃষ্টি অঞ্চলাদি কণ্টকলগ্ন ও চরণাদি কুশক্ষত হওয়া প্রাচীন কবিগণের মতে অতিমাত্র প্রেমচিহ্ন প্রকাশ। অনেক স্থলেই কবিগণ এইরূপ প্রেমব্যঞ্জক ভাব প্রকাশ করিতে ভালবাসেন। যাহা হউক রাজার নিকট এরূপ অনুরাগ চিহ্ন প্রকাশ নিরতিশয় আশাপ্রদ বিবেচিত হইল। রাজার আর নগর গমনে মন রহিল না। তিনি অনন্যমনে শকুন্তলার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। এবং তপোবনের অনতিদূরে শিবির সন্নিবেশ করিয়া রহিলেন।

দ্বিতীয়াঙ্ক।—এই অঙ্কে রাজার শকুন্তলাপ্রেমে অধীরতা বর্ণিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য সমালোচকগণের চক্ষে এই অঙ্ক না থাকিলে ভাল হইত। কিন্তু সংস্কৃত কাব্যে পূর্ব্বরাগ বর্ণনা একটী প্রধান অঙ্গ। কেবল তাহাই নহে, ভারতবর্ষীয়গণের নিকট প্রেমের ক্রমবিকাশ ও তৎপরে তন্ময়তা প্রদর্শিত না হইলে সে প্রেম প্রকৃত প্রেম বলিয়া গণ্য হয় না। এজন্য এই অঙ্কের অবতারণা, এ অঙ্ক না থাকিলে অস্মদ্দেশীয় পণ্ডিতগণের নিকট নাটকখানি অঙ্গহীন বলিয়া বিবেচিত হইত।

শকুন্তলাকে দর্শনাবধি রাজার কিরূপ অবস্থা হইয়াছে তাহা আমরা বিদূষকের নিকট জানিতে পারি। রাজা সে রাত্রি নিদ্রা যান নাই কেবল শকুন্তলাবিষয়ক চিন্তায় রাত্রি যাপন করিয়াছেন।

পরদিন মৃগয়াগমনেও রাজার উৎসাহ নাই। প্রিয়বয়স্য মাধবের অনুরোধে তিনি মৃগয়া গমনে নিবৃত্ত হইলেন কি? না, মৃগগণের দৃষ্টির সহিত শকুন্তলার অপাঙ্গভঙ্গীর সাদৃশ্য আছে যে! সুতরাং রাজা আর তাহাদিগকে কি করিয়া আঘাত করিবেন? রাজা মৃগয়ানিবৃত্ত হইয়া বিদূষকের নিকট শকুন্তলার রূপরাশির ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিদূষক তাঁহার ব্যথার ব্যথী নহে। তাঁহার দুঃখে তাহার সহানুভূতি হইবে কেন? যে কখনও নিজে অনুভব না করিয়াছে সে কি অপরের দুঃখ সহজে অনুধাবন করিতে পারে?

যদিও সংস্কৃত নাটকে বিদূষক চরিত্র একই ভাবে চিত্রিত অর্থাৎ সকল বিদূষককে একই ছাঁচে ঢালা বোধ হইলেও শকুন্তলার বিদূষকের একটু বিশেষত্ব দেখা যায়।

অলঙ্কারের নিয়মানুসারে বিদূষক আকার, বেশ ও বাক্যদ্বারা লোককে হাসাইবে ও সময়ে সময়ে কলহ করিবে। আপনাকে হাস্যকর করাই তাহার প্রধান কার্য্য। কবিগণ উক্ত নিয়মে আবদ্ধ থাকায় সকল বিদূষক প্রায় এক ভাবের দেখা যায়। ইংরাজী নাটকের fool সংস্কৃত নাটকের বিদূষক এক জিনিস নহে। তবে রহস্যপটুতায় উভয়ের সাদৃশ্য আছে। বিদূষক ব্রাহ্মণ কিন্তু তাহাতে ব্রাহ্মণত্ব নাই। বিদূষক সংসারী নহে অর্থাৎ স্ত্রীপুত্র তাহার নাই। ভাঁড়ামি করাই তাহার প্রধান কার্য্য। এইজন্য সে রাজার সখা। রাজার বয়স্য বলিয়া সে কাহাকেও গ্রাহ্য করে না। সকলকেই মুখের উপর দুকথা শুনাইয়া থাকে। কিন্তু বিদূষক মহিষীগণের পরিচারিকার হস্তে কিছু শিক্ষা পাইয়া থাকে। রাজাজ্ঞায় অন্তঃ-পুরে প্রবেশ করিলে কেহ তাহার শিখাকর্ষণ করে কেহ বা প্রহার

পর্য্যন্ত করিয়া থাকে। কাজেই বিদূষক সেদিকে বড় একটা যাইতে চাহে না। মোদকখণ্ড ও অন্যান্য আহারীয় পাইলেই বিদূষক অতিশয় সন্তুষ্ট।

সাধারণতঃ বিদূষকচরিত্র উক্ত প্রকারে চিত্রিত হইলেও অভিজ্ঞান শকুন্তলে বিদূষকের নিজস্ব দেখা যায়। ষষ্ঠাঙ্কে বিদূষকের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। সে স্থলে বিদূষক কেবল ভাঁড়ামি করে নাই, অনেক সার কথা কহিয়াছে। যাহা হউক রাজা বিদূষকের নিকট শকুন্তলাপ্রেম ব্যক্ত করিলে বিদূষক সন্তুষ্ট হইল না। একে সে নগরবাসে অভ্যস্ত তাহাতে অরণ্যবাসক্লেশ, আহারাদির অনিয়ম হইতেছে। কাজেই শকুন্তলাপ্রেমে পড়িলে পাছে রাজা নগরগমনে উদাসীন হন এজন্য রাজাকে বিদূষক সাধ্যমত নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিল। অন্তঃপুরচারিণী ছাড়িয়া বনবাসিনীতে আসক্তি বিদূষকের নিকট পিণ্ড খর্জ্জুর ছাড়িয়া তিন্তিড়ীর আস্বাদ গ্রহণের ন্যায় বোধ হইল। কিন্তু রাজার কথায় যখন তাহার বিশ্বাস হইল যে শকুন্তলা সুন্দরীগণের সারভূতা তখন রাজা যাহাতে সত্বর তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন বিদূষক তাহারই উপদেশ দিতে লাগিল। অতঃপর কি উপায়ে রাজা তপোবনে আর কিছুদিন থাকিতে পারিবেন ইহা চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় কণ্ব শিষ্যগণ আসিয়া তাঁহাকে তপোবনে আর কিছুদিন থাকিয়া রাক্ষসভীতি হইতে আশ্রমবাসীদিগকে রক্ষা করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেন। রাজার আনন্দের সীমা রহিল না। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে রাজ-ধানী হইতে লোক আসিয়া সংবাদ জানাইল যে, রাজমাতা ব্রতো-দ্যাপনের জন্য তাঁহাকে সত্বর গৃহগমনে অনুরোধ করিয়াছেন। রাজা মহাদায়ে ঠেকিলেন। মাতৃআজ্ঞা পালন করিবেন কি

আশ্রম রক্ষা করিবেন প্রথমে স্থির করিতে পারিলেন না। কিন্তু তিনি রাজা। রাজধর্ম্ম পালন তাঁহার অবশ্যকর্ত্তব্য, কাজেই নগরগমনে উৎসাহী হইতে পারিলেন না। মাতৃআজ্ঞাপালনের জন্য বিদূষককে সমস্ত লোকজনের সহিত রাজধানীতে পাঠাইলেন। বিদূষকও সন্তুষ্ট হইল। পাছে মহিষীগণের নিকট বিদূষক শকুন্তলার কথা প্রকাশ করে এজন্য বলিলেন যে শকুন্তলাসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রকৃত নহে। ঋষিগণের আশ্রমরক্ষার জন্যই তিনি তপোবনে রহিলেন।

বিদূষক শকুন্তলাকে দেখে নাই। কবি তাঁহাকে সে অবসর দিলেন না। শেষ পর্য্যন্ত রাজার সহিত থাকিয়া শকুন্তলা পরিণয় ব্যাপার বিদূষককে দেখিবার ও জানিবার সুযোগও দিলেন না। অতঃপর শকুন্তলা পরিণয়ে রাজার পক্ষ হইতে কেহ সাক্ষী রহিল না। সারথি সঙ্গে থাকিলেও সে নিশ্চয়ই সংবাদ রাখিত না। যাহা হউক বিদূষক না থাকিলে যেমন চলে না অর্থাৎ রাজার মনোগত ভাব প্রকাশ করিবার দ্বিতীয় লোক নাই। আবার সেইরূপ বিদূষককে অন্তরিত না করিলে এখানে কবির উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয় না। এজন্য বিদূষককে অগ্রেই সরাইয়া দিলেন।

কাহারও মতে কালিদাস নিজেই বিদূষক ভাবে দেখা দিয়াছেন। এ অনুমান কতদূর সঙ্গত তাহা বলিতে পারি না।

তৃতীয়াঙ্ক। প্রথমাঙ্কে আমরা শকুন্তলার প্রথম দর্শন পাই। সখীসঙ্গে যখন শকুন্তলা আশ্রমবৃক্ষে জলসিঞ্চন করিতেছেন তখন তাঁহাকে মূর্ত্তিময়ী সরলতা বলিয়া আমাদের ধারণা হয়। বল্কলধারিণী শকুন্তলা নিজ বল্কল শিথিল করিতেও পারেন না। সে বিষয়ে তাঁহার সখীর সাহায্য লইতে হয়। আশ্রমবৃক্ষে জলসিঞ্চন

করিতে তাঁহার জল ধার করিতে হয়। মধুকর গুঞ্জন হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য তাঁহার অপরের মুখাপেক্ষী হইতে হয়। যাঁহারা আশ্রমবৃক্ষে সহোদর স্নেহ, তরুলতায় অকৃত্রিম ভালবাসা, মৃগশাবকে বাৎসল্য ভাব, আশ্রমস্থ তাবৎ সামগ্রীই যাঁহার অতিমাত্র যত্ন ও আদরের ধন তাঁহার সরলতা ও সরল প্রাণের সরল প্রেমের গভীরতা বা কত? কে তাহা ইয়ত্তা করিতে পারে?

শকুন্তলা মুগ্ধা। আজীবন তপোবনে বল্কলধারী, রুক্ষকেশ তপস্বীগণকে দর্শন করিয়াছেন। যেমন তাঁহার সমক্ষে সুন্দরমূর্ত্তি প্রিয়দর্শন যুবা দুষ্মন্ত উপস্থিত হইয়াছেন অমনই শকুন্তলার মনে চিত্তবিকার উপস্থিত হইয়াছে। শকুন্তলা সবেমাত্র যৌবনের সীমায় পদার্পণ করিয়াছেন। রাজাকে দেখিয়া তপোবনবিরোধী চিত্তবিকার তাঁহার মনে কেন উপস্থিত হইল? তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। তিনি বুঝিবেন কিরূপে? তাঁহার অজ্ঞাতসারেই তাঁহার হৃদয়মন রাজার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। প্রথম দর্শনেই তিনি রাজাকে কেবলমাত্র প্রীতির চক্ষে দেখেন নাই। তাঁহার জানিবার পূর্ব্বে তদীয় মনপ্রাণ রাজার চরণে সমর্পিত হইয়াছে। প্রথম দর্শনে যে প্রণয় সঞ্চার হয় শকুন্তলার তাহাই হইয়াছে। শকুন্তলা বনবাসিনী। নাগরিক লোক কখনও তাঁহার নয়নগোচর হয় নাই। বিশেষতঃ দুষ্মন্তের ন্যায় দেহশ্রীসম্পন্ন যুবাপুরুষ তিনি কখনও দেখেন নাই। সুতরাং প্রথম দর্শনে রাজার রূপে মুগ্ধ হওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব নহে। কিন্তু অন্তঃপুরচারিণী রূপগর্ব্বে গর্ব্বিতা মহিলাগণসেবিত দুষ্মন্তের মনে শকুন্তলাপ্রেম অঙ্কুরিত হওয়া বিস্ময়কর বটে তথাপি বুঝিতে হইবে শকুন্তলার অসামান্য রূপরাশি দর্শনেই রাজা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার অন্তঃপুরে

সুন্দরী রমণীর অভাব না থাকিতে পারে কিন্তু একাধারে এমন রূপ সম্ভবতঃ তাঁহার চক্ষে কখনও পড়ে নাই। কাজেই তিনি শকুন্তলার অপরূপ রূপমাধুরীতে আকৃষ্ট হইলেন। উভয়ের মধ্যে যে প্রণয় সঞ্চার হইল উভয়ের অতুলনীয় সৌন্দর্য্যই তাহার প্রধান কারণ।

শকুন্তলার মনোগত ভাব তাঁহার সখী প্রিয়ংবদা বুঝিয়াছিল। প্রিয়ংবদা যেমন বুদ্ধিমতী সেইরূপ সহৃদয়। রহস্যপটুতা তাহার যেরূপ মুনিকন্যাসুলভ শালীনতাও তাহার সেইরূপ। রাজার সহিত কথোপকথন কালে প্রিয়ংবদা কোনরূপে মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে নাই। রাজা প্রকৃত পরিচয় স্পষ্ট না দিলেও রাজাকে চিনিতে তাহার বিলম্ব হয় নাই। শকুন্তলার মনে যেরূপ চিত্তবিকার উপস্থিত হইয়াছিল তাহা জানিতেও তাহার বিলম্ব হয় নাই। প্রস্থানকালে শকুন্তলার চরণ কুশক্ষত ও ও বল্কল কুরুবকশাখায় লগ্ন হইলে প্রকৃত বিষয় বুঝিতে তাহার বাকী রহিল না। রাজাকে দর্শনাবধি শকুন্তলার মন বশে ছিল না। সুতরাং তাহার অদর্শনে যে শকুন্তলা দারুণ যাতনা অনুভব করিবেন তাহাতে সন্দেহ কি? তৃতীয়াঙ্কের প্রথমে শকুন্তলার দারুণ বিরহানুভূতি চিত্রিত হইয়াছে। সখীরা তাঁহাকে পদ্মপত্রদ্বারা বীজন করিতেছে কিন্তু শকুন্তলার তাহা অনুভবই হইতেছে না। সখীগণের কথার উত্তরে তিনি বলিলেন "তোমরা কি আমায় বীজন করিতেছ?" এ পর্য্যন্ত সখীদিগের নিকট শকুন্তলা মনোভাব ব্যক্ত করেন নাই। কিন্তু তাহাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করিলে আর চলে না। কাজেই তাহাদের নিকট দুষ্মন্তপ্রেম প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলেন। সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রান্ত হইয়াছে। আর সহ্য করিলে প্রাণ

থাকিবে কি না সন্দেহ। এইজন্য সখীগণ তাঁহাকে মুখ ফুটিয়া দুষ্মন্তের নিকট প্রেম লিপি প্রেরণ করিতে উপদেশ প্রদান করিল। নলিনী পত্রে একটী কবিতা লিখিয়া শকুন্তলা মনোগত ভাব জানাইবার ইচ্ছা করিলেন বটে কিন্তু রাজা পাছে তাহাকে উপেক্ষা করেন এই আশঙ্কা হইতে লাগিল।

রাজাও এদিকে শকুন্তলার দর্শন লাভ করিবার জন্য সেই লতামণ্ডপের অন্তরালে অবস্থিতি করিতেছিলেন। শকুন্তলার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহার আর হর্ষের সীমা রহিল না। তিনি যাঁহাকে পাইবার জন্য নিতান্ত কাতর, সেই শকুন্তলাও তাঁহারই সমাগমলাভে ব্যগ্র। রাজা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। শকুন্তলার সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ও নিজের মনোভাব প্রকাশ করিলেন। শকুন্তলার সখীদ্বয় অতিশয় আনন্দিত হইল। তাহারা শকুন্তলার হইয়া রাজার নিকট এইমাত্র প্রার্থনা করিল যেন তিনি শকুন্তলাকে বিস্মৃত না হন! শকুন্তলা জানিতেন রাজারা বহুপত্নীক। তাঁহার নিজের প্রেমের যেরূপ গভীরতা রাজার তাহা সম্ভব নহে এই জন্য অভিমান ভরে বলিলেন "রাজা অন্তঃপুরস্থিত মহিলাগণের বিরহে কাতর, তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছ কেন"? রাজা তখন শকুন্তলা প্রেমে বিভোর, তিনি শকুন্তলাময় জগৎ দেখিতেছেন, তাই বলিলেন "শকুন্তলাই তাঁহার ধর্ম্মপত্নী হইবেন," সখীরা আশ্বস্ত হইল। কিন্তু শকুন্তলা রাজার প্রেমে নিতান্ত কাতর হইলেও স্ত্রীজাতির মর্য্যাদা ও আশ্রমের পবিত্রতা রক্ষা করিতে বিস্মৃত হইলেন না। রাজা তাঁহার অঙ্গস্পর্শে উদ্যত হইলে তিনি বলিলেন "অবিনয়ের কার্য্য অর্থাৎ বলপ্রয়োগ করিবেন না," আত্মদানে তাঁহার ক্ষমতা নাই। কেননা যতক্ষণ

পর্য্যন্ত মহর্ষি কাশ্যপ তাঁহাকে মন্ত্রদান না করিবেন ততক্ষণ তিনি রাজাকে স্পর্শ করিতে পারেন না। দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ আর্য্যবর্ত্তের সম্রাট দুষ্মন্ত বালিকার নিকট পরাজিত হইলেন। শকুন্তলার কথা তাঁহার মানিয়া লইতে হইল। অতঃপর তিনি শকুন্তলাকে গান্ধর্ব্ব বিবাহের শ্রেষ্ঠতা বুঝাইলেন। রাজর্ষি কন্যারা পূর্ব্বে গান্ধর্ব্ব-বিবাহ করিয়া পিতার নিকট অভিনন্দিতা হইতেন এইরূপ বলিয়া রাজা শকুন্তলাকে অঙ্গদানে সম্মত করাইলেন।

এই মিলনব্যাপারে রাজা যেরূপ অধীরতা প্রকাশ করিয়াছেন, শকুন্তলা সেরূপ করেন নাই। রাজার বিরহে প্রাণ যাইতে বসিয়াছে, রাজাকে প্রেমলিপি পাঠাইতে ব্যগ্র হইয়াছেন তথাপি রাজাকে পাইয়া শকুন্তলা আত্মদানে সম্মত নহেন। তখনও গুরুজনের জন্য অপেক্ষা করিতে তিনি ব্যস্ত। রাজা যদি শকুন্তলাকে গান্ধর্ব্ব বিবাহের শ্রেষ্ঠতা বুঝাইতে সক্ষম না হইতেন তাহা হইলে শকুন্তলা কখনই রাজার অঙ্কশায়িনী হইতেন না। তিনি হয়ত হৃদয়ের ব্যথা হৃদয়ে চাপিয়া স্ত্রীজাতির মর্য্যাদা রক্ষা করিতেন। শকুন্তলাকে আমরা এপর্য্যন্ত সরলা ও মুগ্ধা বলিয়াই জানিয়াছি। তাঁহার হৃদয়বলের তাদৃশ পরিচয় পাই নাই। এই মিলনসময়ে তাঁহার মনের বল দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হই। রাজা দুষ্মন্ত ধীরোদাত্ত নায়ক। তাঁহার চরিত্রবলও যথেষ্ট। তথাপি তিনি মিলনের জন্য এত অধীর হইয়াছেন, এতদূর বাড়াবাড়ি করিয়াছেন যে, নেপথ্যে সখীগণ গৌতমীর আগমন সংবাদ জানাইয়া শকুন্তলাকে সতর্ক না করিলে, শকুন্তলা নিতান্ত বিপন্ন হইতেন। স্ত্রীজাতি অপেক্ষা পুরুষ অধিক চঞ্চল। রাজা দুষ্মন্তের ন্যায় ধীরপ্রকৃতি ব্যক্তিও সে নিয়মের বহির্ভূত নহেন। শকুন্তলা সরলা বালিকা হইলেও,

প্রকৃতির প্রবল উত্তেজনায় নিতান্ত পীড়িতা হইলেও, তিনি আত্ম-মর্য্যাদা বিস্মৃত হন নাই। বালিকার এরূপ চরিত্রবল প্রশংসনীয় নহে কি? কয়জন ব্যক্তি এরূপ স্থলে শকুন্তলার ন্যায় নিজ শালীনতা রক্ষা করিয়া চলিতে সক্ষম হন?

এই স্থানে আমরা শকুন্তলার সখী প্রিয়ংবদা ও অনসূয়ার সহৃদয়তার পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাই। শকুন্তলার জন্য তাঁহাদের মানসিক উদ্বেগ দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়, বাস্তবিক তাহারা শকুন্তলাকে প্রাণসম ভালবাসে। কিসে শকুন্তলা সুস্থ হইবেন, কিসে তিনি রাজার সহিত সঙ্গত হইতে পারিবেন, ইহাই তাহাদের চেষ্টা। অনন্তর যখন রাজার দর্শনলাভ ঘটিল তখনও যাহাতে শকুন্তলার প্রতি রাজার বিশেষ অনুগ্রহ ও প্রীতি হয় সে বিষয়ে তাহারা যত্নশীল। রাজার নিকট আশ্বাসবাণী পাইয়া তবে তাহারা আশ্বস্ত হইল। এরূপ নিঃস্বার্থ ভালবাসার দৃষ্টান্ত অতি বিরল। যাহা হউক শকুন্তলাকে রাজা দুষ্মন্ত গান্ধর্ব্ববিধানে বিবাহ করিলেন। এবং কিছু দিন তপোবনে থাকিয়া মুনিগণের যজ্ঞরক্ষা ও শকুন্তলার সহিত একত্র বাস করিলেন। মুনিগণের কার্য্য সম্পন্ন হইলে তিনি রাজধানীতে গমন করিলেন। শকুন্তলা রাজার বিরহে নিতান্ত কাতর হইলেন। তাঁহার জীবনে এই প্রথম বেদনা অনুভব। কাজেই তিনি যে একাগ্রচিত্তে কেবল দুষ্মন্তের বিষয় চিন্তা করিবেন, তাঁহার মন কেবল প্রিয়জনের অদর্শনজনিত ক্লেশ অনুভব করিবে, আশ্রমের কার্য্যে তাঁহার চিত্ত নিবিষ্ট থাকিবে না ইহা অসম্ভব নহে। কিন্তু কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা হইলে তাহার শাস্তি অবশ্যই ভোগ করিতে হয়। কঠোর সংসার ত মানবের সহিত সমবেদনা প্রকাশ করে না। সরলা শকুন্তলাকেও এই জন্য বিশেষ শাস্তিভোগ করিতে

হইল। একদিন শকুন্তলা তন্ময়চিত্তে দুষ্মন্তের বিষয় চিন্তা করিতেছেন এমন সময় কোপনস্বভাব দুর্ব্বাসা ঋষি আসিয়া অতিথি হইবার ইচ্ছা জানাইলেন। শকুন্তলা ঋষির কথা শুনিতে পাইলেন না। ইচ্ছাপূর্ব্বক শকুন্তলা ঋষির অবমাননা বা অতিথির কথায় তাচ্ছিল্য প্রকাশ করেন নাই। অতিথি আসিয়াছেন ইহা তিনি জানিতেই পারেন নাই। কিন্তু দুর্ব্বাসা ঋষি তাহাকে ক্ষমা করিলেন না। একে তিনি স্বভাবতঃ ক্ষমাবর্জ্জিত তাহাতে অতিথির প্রতি ঔদাসিন্য প্রকাশ দেখিয়া তিনি অভিশাপ দিলেন যে শকুন্তলা যাঁহার চিন্তা করিতেছেন তিনি শকুন্তলাকে বিস্মৃত হইবেন। শকুন্তলা তখন এরূপ চিন্তামগ্ন যে এ ব্যাপারের বিন্দুমাত্রও জানিতে পারিলেন না। শকুন্তলার সখীদ্বয় এই অভিশাপ বাণী শুনিয়া অনেক সাধ্যসাধনা করিয়া দুর্ব্বাসা ঋষিকে প্রসন্ন করিলেন। তখন তিনি বলিলেন কোনরূপ অভিজ্ঞান আভরণ দর্শন করিবামাত্র তিনি শকুন্তলাকে স্মরণ করিবেন। যাহাহউক শকুন্তলা ইহাও জানিতে পারিলেন না। কবি এখানে শকুন্তলার সখীদ্বয়ের মুখে একথা ব্যক্ত করিয়াছেন। নাটকীয় নিয়ম অনুসারে অভিশাপ ব্যাপার প্রভৃতি নেপথ্যে সারিতে হয়। এখানেও সে নিয়ম প্রতিপালিত হইয়াছে, এই অভিশাপ ব্যাপার নেপথ্যে প্রদর্শিত হইলেও ইহাই অভিজ্ঞান শকুন্তলের ভিত্তিস্বরূপ। কেন না এই শাপ বৃত্তান্তে যে অভিজ্ঞানের কথা উক্ত হইয়াছে তাহা হইতে নাটকের ও নাটকাংশের পরিপুষ্টি হইয়াছে। কালিদাসের প্রতিভা বা উদ্ভাবিনী শক্তির পূর্ণ পরিচয় এইখানে প্রদত্ত হইয়াছে। রাজার চরিত্র রক্ষার জন্যই দুর্ব্বাসার অভিশাপ কল্পিত হইয়াছে। নহিলে মহাভারতোক্ত রাজচরিত্র চিত্রিত

করিলে দুষ্মন্তকে নিতান্ত কপটভাষী অসত্যপ্রিয় ভাবে দেখাইতে হইত।

অতঃপর আমরা অনসূয়ার কথায় জানিতে পারি যে রাজা রাজধানী গমন সময়ে স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক শকুন্তলার অঙ্গুলিতে পরাইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন "আমাকে স্মরণ রাখিও," সখীরা আশ্বাসিত হইল যে শকুন্তলার বিপদ সম্ভাবনা নাই। আমরা সকলেই ইহাতে আশ্বস্ত হইতে পারি। সখীরা এ বৃত্তান্ত শকুন্তলার নিকট প্রকাশ করে নাই। কেননা তিনি নিতান্ত কোমলহৃদয়া। এ নিদারুণ সংবাদে তাঁহার যার পর নাই উদ্বেগ জন্মিবার কথা। কাজেই তাঁহার সখীগণ অভিশাপ বৃত্তান্ত তাঁহার নিকট গোপন রাখিল। কিন্তু শকুন্তলার মঙ্গলের জন্য তাহারা তাঁহার উদ্দেশে দৈবকার্য্য সম্পন্ন করিতে উদ্যোগ করিল।

চতুর্থাঙ্ক—দুর্ব্বাসার অভিশাপ বৃত্তান্ত শকুন্তলার সখীদ্বয় কেবল মাত্র জানিতে পারিয়াছিল—শকুন্তলা তাহা জানিতেন না, বিশেষতঃ সখীদ্বয় কাহারও নিকট সে কথা প্রকাশ করে নাই। শকুন্তলার মঙ্গলের জন্য তাহারা যেরূপ চেষ্টা করিতেছিল তাহা প্রশংসনীয় হইলেও, শাপবৃত্তান্ত প্রকাশ না করায় তাহাদের সাবধানতার কুফল ফলিল বলিতে হইবে। যখন শকুন্তলার ভবিষ্যৎ কুশল চিন্তায় তাঁহার সখীদ্বয় ব্যস্ত, পাঠক ও দর্শক, সকলেই যখন শকুন্তলার কি ঘটিবে ভাবিয়া উদ্বিগ্ন হইয়াছেন তখন কবি কণ্বশিষ্যমুখে সংবাদ দিলেন যে ভগবান কশ্যপ প্রবাস হইতে আশ্রমে প্রত্যাগত হইয়াছেন। অতঃপর শকুন্তলার সখী অনসূয়ার নিকট আমরা অবগত হইলাম যে মহর্ষি কশ্যপ শকুন্তলার পরিণয়বৃত্তান্ত আকাশ

বাণীতে জানিতে পারিয়া কিছুমাত্র রুষ্ট হন নাই। বরং প্রসন্নচিত্তে শকুন্তলাকে অভিনন্দন করিয়াছেন।

রাজা দুষ্মন্ত রাজধানীগমনপর্য্যন্ত শকুন্তলার কোন সংবাদ গ্রহণ বা নিজ সংবাদ প্রদান করেন নাই। রাজা দুর্ব্বাসার শাপ-প্রভাবে এরূপ করিয়াছেন কি নিজ প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইয়াছেন তাহা সখীরা বুঝিতে পারিতেছে না। তাহারা রাজাকেই দোষী মনে করিতেছে এবং সরলা শকুন্তলা যে কপটহৃদয় রাজার হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন—ইহাই তাহাদের ধারণা হইতেছে।

মহর্ষি কণ্ব শকুন্তলাকে রাজার সহবাসে গর্ভবতী জানিতে পারিয়া তাঁহাকে রাজধানীতে পাঠাইতে উদ্যোগী হইয়াছেন, একথা আমরা প্রিয়ংবদার মুখে জনিতে পারি। শকুন্তলার গমনে সখী-গণ নিতান্ত কাতর হইবে জানিয়াও শকুন্তলার সুখসম্ভাবনায় তাহারা পরিতোষ অনুভব করিতেছে। প্রিয়সখী শকুন্তলার ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া তাহাদের এতই উৎকণ্ঠা জন্মিয়াছিল। বাল্য-কাল হইতে যাহারা একত্র বর্দ্ধিত হইয়াছে, সমান সুখে দুঃখে যাহারা জীবন যাপন করিয়াছে, এপর্য্যন্ত বিরহ দুঃখ যাহারা জানে না তাহারা শকুন্তলার ন্যায় সরলা সখীকে বিদায় দিতে কত কাতর হইবে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। তথাপি তাহাদের প্রিয়সখী সুখী হইবে ভাবিয়া তাহারা তুষ্ট। দুর্ব্বাসার অভিশাপে তাহা-দের এতই আতঙ্ক জন্মিয়াছে। সখীগণ তাহার যাত্রার মঙ্গলের জন্য আম্রশাখা, তীর্থমৃত্তিকা প্রভৃতি সংগ্রহ করিতেছে। শকুন্তলা পতিগৃহে যাইবেন এজন্য আশ্রমবাসিনী ঋষিপত্নীগণ সূর্য্যোদয়ে স্নানাদি সমাপন করিয়া ধান্যদূর্ব্বা লইয়া শকুন্তলাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, মহর্ষি কাশ্যপের তপপ্রভাবে বনস্পতিগণ শকুন্তলার

সজ্জার জন্য উত্তম বসন ভূষণ প্রদান করিয়াছে। কিন্তু বসনালঙ্কার দ্বারা সাজাইতে ঋষিকন্যারা অনভ্যস্ত। তাই প্রিয়ংবদা চিত্রপট দর্শনে শকুন্তলার অঙ্গে অলঙ্কার পরাইবে। এই আভরণাদি সজ্জা যে কেবল মহর্ষির তপঃপ্রভাব প্রকাশ করিতেছে তাহা নহে। মহর্ষির তনয়াবাৎসল্যের পরিচয় দিতেছে। পতিগৃহে পিতৃদত্ত আভরণভূষণাদি লইয়া যাইতে না পারিলে কন্যাগণের নিতান্ত মানসিক ক্লেশ জন্মে। পাছে শকুন্তলাও সপত্নীসমক্ষে চিত্তক্লেশ ভোগ করেন সেই জন্য মহর্ষি কণ্ব এই সকল সৃষ্টি করিলেন। বিশেষতঃ বল্কল ধারণ করিয়া রাজসভায় গমন নাগরিক লোকের চক্ষে রাজরানীর পক্ষে অসংযত দেখাইতে পারে! সেইজন্য শকুন্তলা বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। এটী কিন্তু অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়ম বিরুদ্ধ।

শকুন্তলা মহর্ষি কণ্বের স্নেহের পুত্তলী, সখীগণের প্রিয় সহচরী, আশ্রমবাসিনী ঋষিপত্নীগণের আদরের সামগ্রী, ও বালক বালিকাগণের প্রিয় বস্তু। তাই আজ সকলেই তাঁহাকে সাজাইতে সমান ব্যস্ত। কিন্তু শকুন্তলা স্বামীদর্শনে উৎসুকা হইলেও তপোবন পরিত্যাগে নিতান্ত কাতর হইতেছেন। এ পর্য্যন্ত যাঁহাদিগকে আপনার বলিয়া জানিতেন তাঁহাদের সকলকেই পরিত্যাগ করিতে হইবে। তপোবনের যে সকল বৃক্ষ ও লতা তাঁহার স্বহস্তরোপিতা, তাহাদের প্রতি তাঁহার সহোদরস্নেহ, যে মৃগশাবকে তাঁহার পুত্রস্নেহ, সে সকলই চিরদিনের মত ছাড়িয়া যাইতে হইবে। তাই তিনি একবার স্বহস্তপালিতা বনজ্যোৎস্না লতার নিকট বিদায় চাহিতেছেন, কখনও বা তাহাকে প্রিয়সখীহস্তে সমর্পণ করিতেছেন। কখনও বা মাতৃহীন মৃগশিশুর অবস্থা ভাবিয়া

অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছেন। কখনও বা মৃগবধূ স্বচ্ছন্দে প্রসূত হইলে সে সংবাদ তাঁহাকে প্রদান করিতে পিতাকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছেন। কখনও বা প্রিয়ংবদা আশ্রমসীমা হইতে তাঁহার সঙ্গ ছাড়িবে ভাবিয়া অধীরা হইতেছেন। তিনি পিতাকে না দেখিয়া কিরূপে থাকিবেন এবং পুনরায় করে তপোবনে আসিবেন মহর্ষিকে তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। এবং যখন শুনিলেন শেষ বয়সে পুত্রকে রাজ্যভার দিয়া বনে আসিতে পারিবেন তখন তাঁহার মন কতকটা আশ্বস্ত হইল। অতঃপর তপঃক্লিষ্ট পিতাকে তাঁহার জন্য উৎকণ্ঠিত হইতে নিষেধ করিয়া গৌতমী ও কণ্বশিষ্য-দ্বয়ের সহিত হস্তিনাপুরে প্রস্থান করিলেন।

মহর্ষি কাশ্যপ—মহর্ষির দর্শনলাভের পূর্ব্বেই আমরা তাঁহার সহৃদয়তার পরিচয় পাই। তিনি আশ্রমে প্রত্যাগত হইয়া প্রসন্ন মনে শকুন্তলাপরিণয় ব্যাপারে সম্মতিদান করিয়াছেন। ইহাতে আমরা তাঁহাকে ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারি না। কেননা তিনি ক্ষমাশীল। প্রথম দর্শনেই তাঁহাকে আমরা শকুন্তলার জন্য কাতর দেখিতে পাই। শকুন্তলা স্বামীগৃহে গমন করিবে, তিনি নিজে তাহার সমস্ত আয়োজন করিয়াছেন, স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া শকুন্তলাকে বসন, ভূষণ প্রভৃতি তপঃপ্রভাবে প্রদান করিয়াছেন। তথাপি শকুন্তলার জন্য তাঁহার চক্ষে জল আসি-তেছে, কণ্ঠ রুদ্ধ হইতেছে, হৃদয় উৎকণ্ঠিত হইতেছে। যে শকুন্তলা আশ্রমতরুতে জলসেচন না করিয়া নিজে জলপান করেন না, নিজ অঙ্গশোভার জন্য একটী তরুপল্লব গ্রহণ করেন না, তরুগণের কুসুমোদ্‌গমা সময়ে যাঁহার আহ্লাদের সীমা থাকে না, তাঁহার জন্য বনবাসী তপস্বীর মন কেন না উৎকণ্ঠিত হইবে।

ব্যাস যুধিষ্ঠিরের নিকট বলিয়াছিলেন "বীতস্পৃহানামভিমুক্তি-ভাজাং ভবন্তি ভব্যেষু হি পক্ষপাতাঃ", মহর্ষি কণ্ণও শকুন্তলার গুণে সেইরূপ আকৃষ্ট। শকুন্তলা যথার্থই তাঁহার আকর্ষণী বিদ্যা। ত্রিকালজ্ঞ ঋষি শকুন্তলার রাজধানীগমন সময়ে তাঁহার মাঙ্গলিক কার্য্য যথাবিধি অনুষ্ঠান করিয়া শিষ্যমুখে দুষ্মন্তকে বলিয়া পাঠাইলেন যেন অন্যান্য মহিষীগণের সহিত তিনি শকুন্তলাকে আদর ও যত্ন করেন। কাশ্যপ ইহার অধিক আর কিছুই বলিলেন না, কেননা পতিসোহাগিনী হওয়া স্ত্রীগণের ভাগ্যের আয়ত্ত সুতরাং তাহা তিনি বলিবেন কেন? কিন্তু শকুন্তলাকে উপদেশ দেওয়ার সময় বলিলেন "গুরুজনের শুশ্রূষা করিবে, সপত্নীগণের প্রতি সখীবৎ আচরণ করিবে, ভর্ত্তা অসম্মান দেখা-ইলেও ক্রোধবশে তাঁহার প্রতিকূল আচরণ করিবে না, পরিচারক-দিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করিবে, এবং নিজের সৌভাগ্যগর্ব্বিত হইবে না, এইরূপ আচরণ করিলে যুবতীরা গৃহিণীপদলাভ করেন, বিপরীত আচরণ করিলে তাহারা পতিকূলের যাতনাস্বরূপ হইয়া থাকেন।" বৃদ্ধ ঋষির বাক্য কয়টী কত মূল্যবান্। হিন্দু কুলস্ত্রীর ইহা অপেক্ষা শিক্ষণীয় বিষয় আর কি আছে? সকল উপদেশের সারাংশ এই একটী মাত্র শ্লোকে প্রকটিত হইয়াছে, কালিদাসের লৌকিক জ্ঞান কত গভীর তাহার পরিচয় এইখানে প্রদর্শিত হইয়াছে।

শকুন্তলার পুত্র জন্মিলে পিতার অদর্শনজনিত শোক মন্দীভূত হইবে, তনয়কে রাজ্যভার দিয়া তিনি পুনরায় আশ্রমে আসিতে পারিবেন এইরূপ প্রবোধদান করিয়া কাশ্যপ শকুন্তলাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু যখন শকুন্তলা বলিলেন "পিতঃ, তপঃক্লিষ্ট

দেহকে আমার চিন্তায় উৎকণ্ঠিত করিবেন না" তখন বৃদ্ধ ঋষির দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইল। শকুন্তলার স্বহস্তরচিত নীবারাবলী প্রভৃতি চিহ্নদর্শনে কাশ্যপের শকুন্তলাশোক নবীকৃত হইবারই কথা। যাহা হউক এইখানেই শকুন্তলা নিক্রান্তা হইলেন। নহিলে নিতান্তই কাশ্যপকে অশ্রুসিক্ত হইতে হইত। শকুন্তলা প্রস্থান করিলে মহর্ষি কণ্ব মনের শান্তিলাভ করিলেন। কেননা পরিণীতা কন্যা স্বামীগৃহে প্রেরণ করিলে গচ্ছিত ধনরাশি প্রত্যর্পণের ন্যায় শান্তিলাভ ঘটে।

মহর্ষি কাশ্যপ চরিত্রে আমরা যেরূপ স্নেহপ্রবণতা দেখিতে পাই সেইরূপ সহৃদয়তা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা দেখিয়া থাকি। তিনি সংসারবিরাগী হইলেও কিসে শকুন্তলা সুখী হইবে সেই চিন্তায় নিমগ্ন। শকুন্তলার মঙ্গলার্থে দৈবকার্য্য করিয়াই তিনি ক্ষান্ত নহেন। নিজের ব্যবহার দ্বারা শকুন্তলা যাহাতে সকলের প্রীতি ও স্নেহ আকর্ষণ করিতে পারেন, সেইরূপ উপদেশ দিলেন। শকুন্তলার মনে পতিগৃহগমনের সময় কোন ক্লেশ না জন্মে এজন্য তাঁহাকে উত্তম বসন ভূষণ দ্বারা সাজাইলেন। কিন্তু যাহাতে এই স্নেহপ্রবণতা তাঁহার ধর্ম্মকার্য্যের ব্যাঘাত না জন্মায় সে দিকে তাঁহার প্রখর দৃষ্টি দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার মন লৌকিক ব্যাপারে কিছুক্ষণের জন্য লিপ্ত থাকিলেও সর্ব্বদা ঈশ্বরে অর্পিত ছিল।

পঞ্চমাঙ্ক—এই অঙ্কে রাজবাটীর অনেক তথ্য অবগত হইতে পারা যায়। প্রথমে দেখা যায় রাজা অন্তঃপুরে বিশ্রামগৃহে প্রিয় সহচর বিদূষকের সহিত রহস্যালাপ করিতেছেন। প্রাচীন কালে রাজগণ দিবসের পূর্ব্বভাগে রাজকার্য্য আলোচনা করিতেন।

মধ্যাহ্নকালে নিত্যকর্ম্ম সমাপনান্তে বিশ্রামগৃহে বিশ্রামসুখ অনুভব করিতেন। অপরাহ্ণে পুনরায় সভাস্থ হইয়া আবশ্যকীয় কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। এখনও দেশীয় রাজ্যগুলিতে এইরূপ ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে।

রাজা যে সময় বিশ্রামসুখ অনুভব করিতেন সে সময় নিতান্ত আবশ্যক না হইলে কেহ রাজার সাক্ষাৎলাভ করিতে পারিত না। অন্তঃপুররক্ষার ভার কঞ্চুকী উপাধিধারী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের হস্তে ছিল। তাঁহার বিনানুমতিতে কেহই অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পারিত না। এই কঞ্চুকী অতি বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ছিলেন।

মুনি, ঋষি প্রভৃতি কেহ রাজার বিশ্রামকালে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে রাজপুরোহিত যথাবিধি তাঁহার অভ্যর্থনা করিতেন। অগ্নিহোত্র গৃহে অতিথির স্থান নির্দ্দিষ্ট হইত। রাজাও সেইখানে যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন।

অন্তঃপুরচারিণী মহিষীগণের আবাসগৃহ ও সঙ্গীতশালা রাজার বিশ্রামগৃহের সহিত সংলগ্ন থাকিত। অথবা এত নিকটে থাকিত যে তাঁহাদের সঙ্গীতালাপ সহজেই রাজা শুনিতে পান।

প্রথমে উল্লিখিত হইয়াছে রাজা দুষ্মন্ত বিদূষকের সহিত বিশ্রামভবনে রহস্যালাপ করিতেছেন এমন সময় সঙ্গীতশালায় সঙ্গীতধ্বনি শ্রবণ করিলেন। রাণী হংসবতী বিষাদভরে গাহিতে-ছিলেন—

"অভিনব মধুর লোভে আকৃষ্ট হইয়া চূতমঞ্জরীকে সেইরূপ পরিচুম্বনের পর কমলে বসিবামাত্র পরিতৃপ্ত হইয়া, মধুকর তুমি, চূতমঞ্জরীকে ভুলিলে কি প্রকারে?"

রাজা বুঝিলেন, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই হংসবতী ঐরূপ

গাহিতেছেন। তাঁহাকে আশ্বস্ত করা আবশ্যক মনে করিয়া রাজা বিদূষককে তাঁহার নিকট পাঠাইলেন। বিদূষক কিন্তু সহজে রাজী হয় নাই। পরিচারিকাগণ তাহার শিখাকর্ষণ করে বলিয়া সে অন্তঃপুরের দিকে যাইতে চাহে না। কিন্তু রাজাজ্ঞা পালন আবশ্যক। এজন্য বিদূষক নাগরিকের ন্যায় চাটুবাক্যে হংসবতীর কোপশান্তি করিতে গমন করিল।

এইস্থলে কালিদাস বহুপত্নীক রাজগণের অবস্থার কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছেন। বহুবিবাহ যে বহু অনর্থের মূল তাহা কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস বিলক্ষণ জানিতেন। বুঝিয়াও প্রচলিত নীতির অনুবর্ত্তী হইয়া রাজচরিত্র সমর্থনের চেষ্টা করিয়াছেন। রাজাদিগের বহুবিবাহ সর্ব্বত্র উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা বহুবিবাহ একেবারে নিষেধ না করিলেও রাজগণের প্রতি বড়ই উদারতা দেখাইয়াছেন। তাঁহারা "তেজীয়সাং ন দোষায়", "দৃষ্টধর্ম্মব্যতিক্রমো সাহসঞ্চ মহতাং" প্রভৃতি বাক্যে রাজাদিগের ব্যভিচার দোষ বলিয়াই গণ্য করেন নাই। সাধারণের ব্যভিচার দূষ্য। রাজাদের সবই শোভা পায়। যাহা হউক তাই বলিয়া যে স্ত্রীমর্য্যাদা হ্রাস হইয়াছিল বা হইতে পারে এরূপ বিশ্বাস করা যায় না। যে দেশের স্ত্রীগণ স্বার্থত্যাগের জলন্ত দৃষ্টান্ত সে দেশে যে নারীজাতি লক্ষ্মীস্বরূপিনী বলিয়া সর্ব্বত্র পূজিতা ও সম্মানিতা হইবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

যাহা হউক হংসবতীর বিষাদ সঙ্গীত শুনিয়া রাজার মনে যেন কেমন একটা উদাস ভাব জন্মিল। রাজা বলিলেন "প্রিয়জনবিরহ না ঘটিলেও মন এরূপ আকুল হইল কেন? এটা কি পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি?" রাজা যেন কি স্মরণ করিতে চেষ্টা

করিতেছেন অথচ তাহা স্মরণ হইতেছে না। তাঁহার মনে কেমন একটা বিস্মৃতির ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে। রাজা না বুঝিলেও আমরা বুঝিতেছি—এই দুর্ব্বাসার অভিশাপের ফল। রাজার মনে যখন এইরূপ উদাসভাব উপস্থিত তখন তাঁহাকে কণ্বশিষ্যগণের আগমন সংবাদ জানাইবার জন্য বৃদ্ধ কঞ্চুকী উপস্থিত হইলেন। কঞ্চুকীর ইচ্ছা নহে যে বিশ্রাম লাভের সময় রাজাকে বিরক্ত করেন। কিন্তু বিলম্ব করিলে রাজকার্য্যের ক্ষতি হইতে পারে বিবেচনা করিয়া বিশেষতঃ লোকরক্ষায় নিযুক্ত রাজগণের বিশ্রামলাভ অসম্ভব মনে করিয়া তিনি ঋষিশিষ্যগণের আগমনসংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। রাজাও তদুত্তরে পুরোহিতের দ্বারা তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনা করিবার আদেশ দিয়া অগ্নিহোত্রগৃহে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার স্থান নিরূপণ করিলেন। অতঃপর প্রতিহারীকে ডাকিয়া অগ্নিহোত্রগৃহের পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে বলিলেন। বাস্তবিক যে রাজা নিজে তাহা জানিতেন না তাহা নহে। পাছে কোন অন্তঃপুরমহিলা অসাবধান অবস্থায় রাজার দৃষ্টিপথে পতিত হন এই জন্য রাজা এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিলেন। অগ্নিহোত্রগৃহের প্রাঙ্গনে উপনীত হইয়া রাজা প্রতিহারীর স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। অহো! যাঁহার উপর পৃথিবী পালনের ভার ন্যস্ত তাঁহাকেও পরিজনের স্কন্ধে ভার রাখিতে হইল!

কবি প্রথমে রাজসমীপ হইতে বিদূষককে স্থানান্তরিত করিতেছেন। তাহার কারণ শকুন্তলার প্রতি রাজার আসক্তির কথা বিদূষক শুনিয়াছিল। রাজা তাহাকে সে কথা ভাঁড়াইলেও বিদূষক তাহা স্মরণ করিতে পারিত। এইজন্য শকুন্তলার

প্রবেশের পূর্ব্বে বিদূষককে স্থানান্তরিত করা কবির আবশ্যক হইল। তৎপরে অন্তঃপুর হইতে অগ্নিহোত্রগৃহে রাজাকে স্থানান্তরিত করা কবি আবশ্যক মনে করিলেন। কেননা অন্তঃপুরে শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান ঘটিতে পারিত কি না সন্দেহ। রাজমাতা ও রাজমহিষীদিগের সহানুভূতি নিশ্চয়ই শকুন্তলার প্রতি আকৃষ্ট হইত। তাহা হইলে রাজা নিশ্চয়ই মহাবিপদে পড়িতেন। কাজেই রাজাকে বাঁচাইবার জন্য কবি তাঁহাকে অগ্নিহোত্র গৃহে লইয়া গেলেন। এতদ্দ্বারা ঋষিগণের প্রতিও রাজার সমধিক সম্মান দেখান হইল।

অতঃপর কঞ্চুকী ও পুরোহিতের সহিত কণ্বশিষ্যদ্বয়, গৌতমী ও শকুন্তলাকে সমভিব্যাহারে লইয়া প্রবেশ করিলেন। রাজা স্বয়ং দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। মুনিশিষ্যগণ চিরকাল অরণ্যে বাস করিয়া আসিতেছেন। কখন রাজধানী ও রাজসভা দেখেন নাই। সুতরাং রাজসমীপে বহু লোকজন সমবেত দেখিয়া তাঁহাদের অন্যতম শার্ঙ্গরব মনে করিলেন, আশ্রমস্থ কোন গৃহে অগ্নিসংযোগ হইলে যেমন লোক সমাগম হয় রাজভবনেও যেন তাহাই হইয়াছে। অপরশিষ্য শারদ্বত রাজভবনে লোকসমাগম দেখিয়া বিস্মিত বা ভীত হইলেন না। শুচি ব্যক্তি অশুচি ব্যক্তিকে যেরূপ চক্ষে দেখিয়া থাকে তিনিও বিষয়সুখনিরত ব্যক্তিগণকে সেইরূপ মনে করিলেন। অতঃপর কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসার পূর্ব্বে অবগুণ্ঠনবতী শকুন্তলাকে দেখিয়া রাজার নয়ন মন সেই দিকে আকৃষ্ট হইল। তপোবনের যে রূপরাশি দেখিয়া কয়েকমাসমাত্র পূর্ব্বে তিনি আত্মহারা হইয়াছিলেন, সে রূপলাবণ্য এখনও যে তাঁহার মনোহরণ করিবে

তাহাতে আশ্চর্য্য কি ? তবে তপোবনে তিনি সাধারণ লোকের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন। এখানে অবশ্য তিনি তাহা নহেন। এখানে তিনি ধর্ম্মাসনস্থ রাজা। সাধারণ মনুষ্যজনোচিত চিত্তচাঞ্চল্য জন্মিলেও এস্থলে তাঁহাকে সমস্ত চিত্তবৃত্তি সংযত করিয়া চলিতে হইবে। কাজেই তপোবনের স্থায় এস্থলে তিনি বৃক্ষান্তরালে অবস্থিতি করিয়া শকুন্তলার অনিন্দিত রূপরাশি দর্শন করিয়া চক্ষু সার্থক করিতে পারেন না। এস্থলে তিনি বলিতে বাধ্য হইলেন "পরস্ত্রী দর্শন করা উচিত নয়।" অনন্তর কুশল জিজ্ঞাসার পরে কণ্বশিষ্যগণ রাজাকে জানাইলেন যে, শকুন্তলা তাঁহার পরিণীতা ভার্য্যা ও তাঁহার সহবাসে গর্ভবতী হইয়াছেন, এক্ষণে রাজার ধর্ম্মকার্য্যে সহায়তার জন্য মহর্ষি তাঁহাকে রাজান্তঃপুরে পাঠাইয়াছেন।" এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া রাজা বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। কণ্বশিষ্যগণ পুনরায় যখন বলিলেন "রাজা আপনি লোকবৃত্তান্ত বিশেষরূপ অবগত আছেন। সতী স্ত্রী স্বামীর অপ্রিয় হইলেও তাহার বন্ধুজন তাহার স্বামীসমীপে অবস্থানই প্রার্থনা করিয়া থাকে।" তখন রাজা বলিলেন "ইনি কি আমার পরিণীতা পত্নী ?" রাজার এই উত্তরে কণ্বশিষ্য শার্ঙ্গরব গর্জ্জিয়া উঠিলেন এবং গর্ব্বিত বাক্যে রাজাকে ভৎর্সনা করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐশ্বর্য্যমত্ত ব্যক্তিগণ প্রায় এইরূপ হইয়া থাকে, রাজার ধর্ম্মবিমুখ হইয়া গান্ধর্ব্ব পরিণয় অস্বীকার করা কি উচিত ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিলেন। রাজাও অসন্তুষ্ট হইলেন তথাপি তরুণতাপসের প্রতি রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করিলেন না। এরূপ বাক্‌বিতণ্ডায় ফল লাভের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া আর্য্যা গৌতমী শকুন্তলার অবগুণ্ঠন মোচন করিলেন। কেননা

সেই মুখ খানি দেখিয়া রাজার পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ হইবার কথা। কিন্তু রাজার কি আর সে কথা স্মরণ আছে? দুর্ব্বাসার অভিশাপে যে রাজার পূর্ব্বস্মৃতি লোপ পাইয়াছে তাহা রাজা, গৌতমী ও শকুন্তলা কেহই অবগত নহেন। সুতরাং শকুন্তলার সে মুখশ্রী দেখিয়া রাজার মনে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। তিনি তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন কি পরিত্যাগ করিবেন কিছুই স্থির করিতে সমর্থ হইলেন না। প্রতিহারী বলিল, ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি ব্যতীত আর অনায়াসলব্ধ কে এ রূপরাশি গ্রহণ করিতে বিচার করে? প্রতিহারীর এই উক্তিতে রাজার চমক ভাঙ্গিল। তাঁহার সন্দেহ দূর হইল। তিনি শার্ঙ্গরবের প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন যে কিছুতেই তিনি পরিণয় ব্যাপার স্মরণ করিতে পারিতেছেন না। সুতরাং অন্তঃস্বত্বা স্ত্রীকে গ্রহণ করিয়া কিরূপে গর্ভস্থ সন্তানের ক্ষেত্রজ পিতা হইতে পারেন? ইহা শুনিয়া শার্ঙ্গরব পুনরায় ভর্ৎসনা করিয়া রাজাকে বলিলেন যে দস্যুর ন্যায় তিনি তপোবনে শকুন্তলার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছেন। রাজা ইহার উত্তর করিবার পূর্ব্বেই বুদ্ধিমান শারদ্বত উগ্রপ্রকৃতি শার্ঙ্গরবকে নিবারণ করিয়া শকুন্তলাকে রাজার বিশ্বাসজনক উত্তর দিতে বলিলেন।

শকুন্তলা রাজসমীপে প্রবেশকালেই অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়াছিলেন। তাঁহার দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দিত হইতেছিল। তাঁহার মনে নানা সন্দেহ উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে উৎকলিকাকুল করিয়াছিল। তিনি রাজাকে পরিণয়ে সন্দেহবান্ দেখিয়া নিতান্ত কাতর হইয়াছিলেন। এক্ষণে শারদ্বতের কথামত রাজাকে কি বলিবেন প্রথমে ঠিক করিতে পারিলেন না। তাদৃশ অনুরাগে যখন এরূপ ভাববিপর্য্যয় তখন আর কি বলিবেন। নিজ দোষ

স্থালনের জন্য কিছু বলিতে বাধ্য হইলেন। আর্য্যপুত্র বলিয়া সম্বোধন করিতে যাইয়া তাহা পারিলেন না। কেননা রাজার যে তখন পরিণয়েই সন্দেহ! কেবল বলিলেন, আশ্রমপদে তাদৃশ অনুরাগ প্রকাশ দ্বারা সরলা বালাকে প্রতারণা করিয়া এখন এরূপ নিষ্ঠুর ভাবে প্রত্যাখ্যান করা পুরুবংশীয়ের উচিত হইল কি? শকুন্তলার কথা শুনিয়া রাজা তাঁহাকে নিষেধ করিয়া বলিলেন, তুমি কি আমাকে পতিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছ? শকুন্তলা বলিলেন "যদি আমাকে পরকীয়া মহিলা মনে করিয়া পরমার্থহানি আশঙ্কা করেন তবে অভিজ্ঞান দেখাইয়া আপনার সন্দেহ দূর করিতেছি।" রাজা স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু শকুন্তলা ত জানিতেন না যে, রাজদত্ত অঙ্গুরীয়ক তাঁহার অঙ্গুলিচ্যুত হইয়াছে; পথে শচী তীর্থে অবগাহনকালে অঙ্গুরীয়ক জলে পড়িয়াছে। তাই তিনি শূন্য অঙ্গুলি দেখিয়া বিষাদভরে গৌতমীর মুখপানে চাহিলেন। রাজা মনে করিলেন শকুন্তলা তাঁহাকে প্রবঞ্চনা করিতেছেন। তিনি প্রকাশ্যভাবে বলিলেন যে, স্ত্রীদিগের প্রত্যুৎপন্নমতি এইরূপ। উপায়ান্তর না দেখিয়া শকুন্তলা তাঁহাকে পূর্ব্বকথা স্মরণ করাইয়া দিতে চেষ্টা করিলেন। কোনদিন নবমালিকামণ্ডপে শকুন্তলার প্রতিপালিত মৃগশিশু উপস্থিত হইলে রাজা তাহাকে পানীয় জল প্রদান করেন। কিন্তু রাজার হস্তস্থিত জল পান না করিয়া হরিণশিশু শকুন্তলার হস্তস্থ জল পান করিয়াছিল। রাজা তাই পরিহাস করিয়া বলিয়াছিলেন, সকলে স্বজনকেই বিশ্বাস করে। অর্থাৎ অরণ্যচর মৃগশিশু অরণ্যবাসিনী শকুন্তলাকে বিশ্বাস করিতে পারে নাগরিককে বিশ্বাস করিতে পারে না। সরলা শকুন্তলার সরল প্রাণের সরলতামাখা কথা

শুনিয়া রাজা বলিলেন, এইরূপ মধুময় অসত্য বাক্য দ্বারা বিষয়ী লোকেরা কুলটাকর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়া থাকে। রাজার যখন পরিণয়বৃত্তান্তই মনে নাই তখন এসকল কথা মনে থাকিবে কিরূপে? কাজেই শকুন্তলাকে তিনি ভ্রষ্টা মনে করিলেন। শকুন্তলার সরলতা তাঁহার নিকট কুলটার কপটতা বোধ হইতে লাগিল। গৌতমী তাঁহাকে সেরূপ ভাবনা মনে স্থান দেওয়া অনুচিত বলিলেও রাজা দৃঢ়তার সহিত নিজ ধারণা পোষণ করিবার কারণ দেখাইলেন যে, যখন অশিক্ষিত অমানুষী অর্থাৎ পশুযোনির মধ্যেও চাতুর্য্য প্রকাশ দেখা যায় তখন বুদ্ধিমতী মানুষীদিগের ত কথাই নাই—কোকিলের শাবক ত কাকের বাসায় প্রতিপালিত হইয়া থাকে।

রাজার উক্তি শ্রবণে শকুন্তলা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। এতক্ষণ অসাধারণ সহিষ্ণুতার সহিত তিনি সমস্ত সহ করিয়াছিলেন। তিনি রাজরাণীরূপে গৃহীত হইবার আশা করিয়া আসিয়াছিলেন সেস্থলে তিনি কুলটা শব্দে অভিহিত হইলেন। তাঁহার সরলতা কপটতা নামে পরিচিত হইল। রাজা সমস্তই বিপরীতভাবে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এরূপ ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটিলে কে স্থির থাকিতে পারে? যখন শত চেষ্টা করিয়াও শকুন্তলা রাজাকে পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ করাইতে পারিলেন না, যখন রাজা শকুন্তলাকে কুলটা স্ত্রী মনে করিয়া তাঁহার প্রতি অপমান বাক্য প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন তখনও পতিব্রতা শকুন্তলা তাদৃশ বিচলিতা হন নাই, স্বামীর প্রতি অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করেন নাই। কিন্তু যখন রাজা তির্য্যগজাতির চাতুরীর সহিত শকুন্তলার কপটতার তুলনা করিলেন তখন আর শকুন্তলা স্থির

থাকিতে পারিলেন না। তিনি মহর্ষি কাশ্যপের উপদেশ বাক্য ভুলিয়া রাজাকে কঠোর ভাষায় সম্বোধন করিয়া বলিলেন "অনার্য্য, আত্মনঃ হৃদয়ানুমানেন প্রেক্ষসে?"

রাজা এই পরুষ বাক্যে রুষ্ট না হইয়া বরং শকুন্তলার কোপ যে অকৃত্রিম ইহাই মনে করিতে লাগিলেন। তাঁহার মন পুনরায় সন্দেহদোলায় দুলিতে লাগিল। রাজা কর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে রাজপুরোহিত শকুন্তলাকে বলিলেন "ভদ্রে, দুষ্মন্ত যখন যাহা করেন তাহা সকল লোক জানিতে পারে। তোমাকে বিবাহ করিয়াছেন তাহাত আমরা কেহ অবগত নহি।" শকুন্তলা প্রমাণ দেখাইতে পারেন নাই। আর কি বলিবেন? কেবল রাজাকে পুরুবংশীয় প্রত্যয় করিয়া তিনি গান্ধর্ব্বমতে বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

শার্ঙ্গরব এতক্ষণ নিস্তব্ধ ছিলেন। শকুন্তলার রোদনে ব্যথিত হইয়া তিনি বলিলেন, ভাবিয়া কাজ না করিলে পরে এইরূপে অনুতাপ ভোগ করিতে হয়,—অবিমৃষ্যকারিতার ফল পাইতে হয়। রাজাকে বলিলেন "যে ব্যক্তি কখন শাঠ্য কাহাকে বলে জানে না তাহার কথাই প্রমাণ।" রাজা তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে শকুন্তলাকে প্রতারণা করিয়া তাঁহার লাভ কি? শার্ঙ্গরব বলিলেন "বিনাশ" (অথবা লোকাপবাদ) লাভ। রাজা তদুত্তরে বলিলেন "পুরুবংশীয়েরা তাহা অর্জ্জন করিবেন একথা শ্রদ্ধেয় নহে।" এই স্থলে শারদ্বত পুনরায় শার্ঙ্গরবকে নিবারণ করিয়া রাজাকে বলিলেন "তোমার এই পত্নী গ্রহণ কর বা না কর তোমার ইচ্ছা। স্ত্রীর উপর স্বামীর সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা

আছে" ইহা বলিয়া তাঁহারা প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন। শকুন্তলা কাঁদিতে কাঁদিত তাঁহাদের অনুগমনপ্রবৃত্তা হইলে করুণ-হৃদয়া গৌতমী শকুন্তলাকে লইয়া যাইবার ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু শার্ঙ্গরব স্বীকৃত হইলেন না। শকুন্তলার দিকে ক্রোধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিলেন যদি আত্মাকে শুচি বলিয়া জান তবে পতি-কুলে তোমার দাস্যও ভাল তথাপি পিতার চিন্তার কারণ হওয়া উচিত নহে। শকুন্তলা কাঁপিতে লাগিলেন। রাজা ঋষিশিষ্য-দ্বয়কে বলিলেন "আপনারা ইহাকে কেন ফেলিয়া যাইতেছেন। পুরুবংশীয়েরা পরস্ত্রীবিমুখ।" শার্ঙ্গরব বলিলেন "যদি কখনও পরিচয় বৃত্তান্ত স্মরণ হয় তখন আপনার ত অনুতাপ হইতে পারে।"

রাজা তখন পুরোহিতের মত জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন "প্রসব না হওয়া পর্য্যন্ত শকুন্তলা আমার গৃহে থাকুন। প্রথমে চক্রবর্ত্তী লক্ষণাক্রান্ত পুত্র জন্মিবার কথা।" সেরূপ পুত্র জন্মিলে ইনি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবেন। অন্যথা পিতার আলয়ে যাইবেন।" পুরোহিতের কথায় রাজা স্বীকৃত হইলেন। শকুন্তলা রোদন করিতে করিতে পুরোহিতের অনুগমন করিলেন। তাঁহার মনে হইল পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া তাঁহাকে তখনই গ্রহণ করুক। কাজেও সে আশা ফলবতী হইল। পুরোহিতের গৃহে আর তাঁহাকে যাইতে হইল না, তাঁহাকে আর পুত্র প্রসব রূপ পরীক্ষা দিতে হইল না। পথিমধ্যে তাঁহাকে তাঁহার মাতা আকাশপথে তুলিয়া লইয়া প্রস্থান করিলেন। রাজা শুনিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। পরিণয় বৃত্তান্ত স্মরণ না হইলেও তাঁহার মন শকুন্তলার কথায় আস্থা স্থাপন করিতে চাহিল। তিনি বিশ্রামগৃহে গমন করিলেন।

পঞ্চমাঙ্কে আমরা শকুন্তলাকে মূর্ত্তিমতী পতিব্রতারূপে দেখিতে পাই। স্বামীর নিকট অপমানিতা ও প্রত্যাখ্যাতা হইলেও তিনি সকলই সহ্য করিয়াছেন। তাঁহার মস্তকে কলঙ্কের গুরুভার চাপাইলেও, তাঁহাকে অসত্যভাষিণী, অসত্যবৃত্তা বলিলেও তিনি কেবল বলিয়াছেন, "পুরুবংশের কথায় বিশ্বাস করিয়াই প্রতারিত হইয়াছি"। একবারমাত্র তিনি রাজাকে "অনার্য্য" শব্দে সম্বোধন করিয়া "আত্মবৎ সকলকে মনে করেন" বলিয়া কোপ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাতে কোন কোন সমালোচক তাঁহাকে অপরাধিনী করিয়াছেন। পতিব্রতা ভার্য্যার মুখে "অনার্য্য" (অর্থাৎ অপূজ্য) শব্দ ব্যবহার করা গর্হিত কার্য্য, সমালোচক মহাশয়েরা এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; কিন্তু বাস্তবিক অনার্য্য শব্দটী আজকাল যেরূপভাবে ব্যবহৃত হয়, পূর্ব্বে সেরূপ হইত বলিয়া বিশ্বাস হয় না। কেননা রাজা ইহাতে কিছুমাত্র দোষ দেখেন নাই। বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের প্রতি ব্যভিচারের আরোপ করিলে, স্ত্রীলোকমাত্রেই তাহা সহ্য করিতে পারেন না। প্রকাশ্য রাজসভায় ত কথাই নাই। যত কিছু অপবাদ আছে, তাহার মধ্যে স্ত্রীলোকের অসতী অপবাদ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মর্ম্মস্পর্শী। অপিচ যে স্থলে রাজা তির্য্যগ্‌জাতির প্রবঞ্চনার কথা তুলিয়া শকুন্তলার কপটতার উল্লেখ করিয়াছেন, সেস্থলে শকুন্তলার জন্ম-সম্বন্ধে এবং পরগৃহে প্রতিপালিত হওয়া সম্বন্ধে যেন কটাক্ষ করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ শকুন্তলা তখন এইরূপ মনে করিয়া থাকিবেন; সুতরাং সেরূপ স্থলে কেবলমাত্র অনার্য্য (অর্থাৎ অপূজ্য) শব্দে সম্বোধন করিয়া শকুন্তলা মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন নাই, —ইহাই বুঝিতে পারা যাইতেছে। কোনও সাধ্বী স্ত্রী যে একথা না বলিয়া থাকিতে পারেন, এরূপ

বিশ্বাস হয় না। অপর কোন ঋষিকন্যা হইলে হয়ত স্বামীকে অভি-শাপ না দিয়া বা অন্যপ্রকারে প্রতিশোধ লইবার প্রতিজ্ঞা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না; সুতরাং শকুন্তলা চরিত্রে এতদ্বারা দোষ-স্পর্শ হইতে পারে, ইহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। এই প্রত্যাখ্যান ব্যাপারে কবি বুঝাইয়াছেন,গান্ধর্ব্ব-বিবাহ প্রশস্ত নহে। বিবাহাদি কার্য্য বহুলোকের জ্ঞাতসারে হওয়া আবশ্যক। নহিলে পুরোহিত বলিবেন কেন যে দুষ্মন্ত যখন যে কার্য্য করেন, তাহা সকলেই জানিতে পারে।

অতঃপর প্রত্যাখ্যান-ব্যাপারে দুষ্মন্তচরিত্রে কোন দোষস্পর্শ হইয়াছে কিনা? ধর্ম্মাসনস্থ রাজা নিজে প্রত্যর্থী ও নিজেই বিচারক তিনি শকুন্তলার রূপে পুনরায় মুগ্ধ হইলেও কর্ত্তব্যচ্যুত হইলেন না, অর্থাৎ পরিণয়ব্যাপার স্মরণ না হওয়ায় শকুন্তলাকে মহিষীরূপে গ্রহণ করিতে পারিলেন না। ইহাতে তিনি নিজ চরিত্রবল দেখা-ইলেন। ঋষিশিষ্যগণ শকুন্তলাকে তাঁহার পরিণীতা—ভার্য্যা বলিলেও কোন প্রমাণ দেখান নাই। তাঁহারা প্রমাণ প্রদর্শনের ভার শকুন্তলার উপর দিয়াছিলেন। কাজেই তাঁহাদের কথায় রাজা শকুন্তলাকে পত্নীভাবে অঙ্গীকার করিতে পারেন না। প্রমাণ-পরতন্ত্র বিচারপতি প্রমাণ চাহিয়াছেন। কণ্বশিষ্যগণ প্রমাণ দেখাইতে পারেন নাই। তাঁহারা গুরুর আদেশমাত্র রাজাকে জ্ঞাপন করিয়াছেন, এবং শকুন্তলা মিথ্যা বলিতে পারেন না, ইহাই বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। এরূপ স্থলে রাজা মনে করিয়া-ছেন, সরলহৃদয় ঋষিশিষ্যগণ শকুন্তলার প্রতারণা বাক্যে প্রবঞ্চিত হইয়া থাকিবেন। কাজেই তাঁহাদের কথায় ধর্ম্মকার্য্যানুষ্ঠানের প্রধান সহায় যে পত্নী তাহাকে স্বীকার করিবেন কিরূপে? এস্থলে

রাজা ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন নাই। প্রামাণিক কোন কথা বলিলে, যদি রাজা তাহাতে অনাস্থাবান হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে দোষী হইতে হইত।

আমাদের বিশ্বাস শকুন্তলা যদি উত্তম বস্ত্রাভরণ পরিধান করিয়া রাজভবনে উপস্থিত না হইতেন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ রাজার মনে তাদৃশ সন্দেহ জন্মিত না। ঋষিকন্যাকে সুন্দর বেশ ভূষায় সজ্জিত দেখিয়া রাজার মনে সন্দেহ বদ্ধমূল হইয়া থাকিবে। যাহা হউক শেষে শকুন্তলার সরল ব্যবহার দেখিয়া রাজার মন আকুল হইয়াছিল। শকুন্তলাকে কুলটা বলিয়া প্রথমে তাঁহার যে ধারণা জন্মিয়াছিল, তাহা শকুন্তলার প্রস্থানের সহিতই অন্তর্হিত হইয়াছিল। শকুন্তলার "অনার্য্য" শব্দপ্রয়োগ যদি তিনি দোষাবহ মনে করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার মন পুনরায় শকুন্তলার দিকে আকৃষ্ট হইত কিনা সন্দেহ।

শকুন্তলা আকাশপথে নীতা হইয়াছেন, শুনিয়া সভাস্থ সকলে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। রাজা বিশ্রাম-গৃহে গমন তৎপর হইলেন। কর্ত্তব্যনিষ্ঠা দেখাইয়াছেন, বলিয়া তাঁহার মনে যে চিত্তপ্রসাদ জন্মিয়াছিল তাহার পরিবর্ত্তে এখন বলবতী উৎকণ্ঠা জন্মিল। হয়ত মুনিকন্যা (শকুন্তলা) যথার্থ বলিয়াছেন, আমিই বিস্মৃত হইয়া প্রত্যাখ্যান করিলাম; এইরূপ অশান্তি জন্মিয়া তাঁহার মনকে কষ্ট দিতে লাগিল। বাস্ত-[বিক] কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের স্বভাবই এইরূপ। তাঁহারা নিজে ঠি[ক] না বুঝিলে, সহস্র অনুনয়-অনুরোধে কোন কার্য্য করেন না। [আ]বার কৃত-কার্য্যে যদি প্রমাদ লক্ষিত হয়, তবে তাঁহাদের অশান্তির অবধি থাকে না। দুষ্মন্তের মনেরও এখন তদ্রূপ অবস্থা।

তাঁহার মানসিক অশান্তি যেন তাঁহাকে বলিতে লাগিল, তিনি শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া ঠিক কাজ করেন নাই।

অতঃপর ধীবরের নিকট শকুন্তলার করচ্যুত অঙ্গুরীয়ক দেখিয়া দুষ্মন্তের সকল কথা স্মরণ হইল। তাঁহার নয়নযুগল হইতে অবিরল বারিধারা বহিতে লাগিল। তিনি যে নিতান্ত নিষ্ঠুরের ন্যায় গর্ভবতী শকুন্তলাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, ইহা ভাবিয়া তাঁহার মন উৎকলিকাকুল হইল। তিনি দারুণ ক্লেশ অনুভব করিতে লাগিলেন। একদিকে শকুন্তলার বিরহ অপরদিকে নিজকৃত নিষ্ঠুরাচরণ ভাবিয়া তিনি নিতান্ত ম্রিয়মান হইলেন। রাজকার্য্যে তাঁহার উৎসাহ রহিল না।

পঞ্চমাঙ্কের শেষে যে ধীবর ও রক্ষিপুরুষের চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা হইতে আমরা প্রাচীন কালের রক্ষিপুরুষগণের চরিত্রের আভাস পাই। সে সময়েও উৎকোচগ্রহণপ্রথা প্রচলিত ছিল দেখা যায়। আরও বুঝিতে পারা যায় যে, বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ তখনও যাগাদিকার্য্যে পশুবধ করিতেন। কালিদাস অহিংসা পরম ধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। ধীবরের চরিত্রে একটু বিশেষত্ব আছে। ধীবরের ভাষাও অতিশয় স্বাভাবিক।

ষষ্ঠ অঙ্ক—এই অঙ্কে রাজার বিরহ কাতর অবস্থা অতিমাত্র নিপুণতার সহিত চিত্রিত হইয়াছে। সসাগরা ভারতসম্রাটের মনে শান্তি নাই সুতরাং রাজ্যমধ্যে বসন্তোৎসব নিষিদ্ধ হইয়াছে। বলিতে গেলে এই উৎসবই আর্য্যাবর্ত্তের হিন্দুগণের প্রধান উৎসবরূপে গণ্য ছিল। এরূপ উৎসব আর নাই। বাসন্তী পঞ্চমীর পূর্ব্ব হইতে দোলপূর্ণিমা পর্য্যন্ত এই উৎসব চলিয়া থাকে। অদ্যাপি পশ্চিমাঞ্চলে এ

প্রথা প্রচলিত আছে। এ হেন জাতীয় উৎসব রাজাদেশে বন্ধ! রাজার মন নিরানন্দ বলিয়া রাজ্যখণ্ডও নিরানন্দে মগ্ন হইল। সানুমতী (বা মিশ্রকেশী) নামে অপ্সরা মেনকার আদেশে রাজার অবস্থা জানিতে আসিয়া রাজ্যের ঈদৃশভাব দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া পড়িলেন। তৎপরে তিনি রাজার অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলেন। রাজার রাজকার্য্যে মন নাই। সচিবের উপর সে ভার দিয়া তিনি বিদূষকের সহিত শকুন্তলা-বিষয়ক কথোপকথনে সময়ক্ষেপ করিতেছেন। শকুন্তলার প্রতি রাজার প্রথম অনুরাগের কথা অবগত থাকিয়াও তাঁহার সাক্ষাতে এতদিন বিদূষক সে কথা তুলে নাই কেন সেজন্য রাজা তাহাকে অনুযোগ করিতেছেন। কখনও বা শকুন্তলার করচ্যুত স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক লক্ষ্য করিয়া ভৎর্সনা করিতেছেন; কখনও বা স্বহস্ত-লিখিত শকুন্তলাচিত্র দর্শন করিয়া আমূল বৃত্তান্ত স্মরণ করিতেছেন আর নয়ন জলে চিত্রপট আর্দ্র হইতেছে।

রাজা বহুপত্নীক। তাঁহার অন্তঃপুরে স্ত্রীরত্নের অভাব নাই। তথাপি শকুন্তলার জন্য রাজা উন্মত্তপ্রায় হইয়াছেন। এ পর্য্যন্ত বহুভার্য্যাসত্ত্বেও তিনি পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হন নাই। সেইজন্য গর্ভবতী শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া তিনি আরও আকুল হইয়াছেন। একে তিনি শকুন্তলাপ্রেমে আত্মহারা, তাহাতে আসন্নপ্রসবা ভার্য্যাত্যাগে সন্তানমুখ নিরীক্ষণের আশা দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, কাজেই কিছুতেই রাজা মনকে প্রবোধ দিতে পারিতেছেন না। বিদূষকের রহস্যালাপে হৃদয়বেদনা প্রশমিত না হইয়া বর্দ্ধিতই হইতেছে। রাজা কেবলমাত্র শকুন্তলার চিত্রপট লইয়া দেখিতেছেন। কখনও চিত্রিত শকুন্তলাকে প্রকৃত শকুন্তলা-

ভ্রমে আলাপ করিতেছেন। চিত্রপটে শকুন্তলার মুখের নিকট ভ্রমর উড়িতেছে। রাজা তাহাকে দেখিয়া মনে করিলেন সে বুঝি শকুন্তলার অধর দংশন করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাই তাহাকে কমলের অভ্যন্তরে বন্ধন করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইলেন। রাজার প্রেমোন্মত্ততা দেখিয়া বিদূষক বলিল—"এটা যে চিত্রপট"! তখন রাজার চমক ভাঙ্গিল। এতক্ষণ তিনি তন্ময়ভাবে শকুন্তলার দর্শনসুখ অনুভব করিতেছিলেন। চিত্রিত শকুন্তলাকে বাস্তব শকুন্তলা মনে করিয়া তাঁহার সাহচর্য্য অনুভব করিতেছিলেন। বিদূষকের কথায় সে মোহ দুর হইল অমনই বাষ্পবারি বিগলিত হইয়া তাঁহার দৃষ্টিরোধ করিল। শকুন্তলার পক্ষ হইতে অপ্সরা সানুমতী রাজার অবস্থা জানিতে আসিয়াছিলেন। তিনিও রাজার প্রেমের গভীরতা,—শকুন্তলার বিরহে তাঁহার কাতরতা দেখিয়া তিনিও রাজার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলেন।

এই সময়ে যদি অন্তঃপুরচারিণী চতুরিকা সংবাদ না আনিত যে রাজ্ঞী বসুমতী তাহার হস্ত হইতে চিত্রতাও বলপূর্ব্বক লইয়াছেন এবং সেখানেও আসিতে পারেন ; তাহা হইলে নিশ্চয়ই রাজার বিরহ-যাতনা অসহ্য হইয়া তাঁহার চেতনা লোপ করিত। রাজ্ঞী আসিলেন না। প্রতিহারী সংবাদ আনিল যে ধনমিত্র নামক অপুত্রক বণিক সমুদ্র-পথে গতাসু হইয়াছে। তাহার সম্পত্তি রাজকোষে লওয়া হউক ; কিন্তু ধর্ম্মনিষ্ঠ রাজা তাহা করিলেন না। মৃত বণিকের গর্ভবতী ভার্য্যাকে সকল ধন অর্পণ করিলেন। এবং নিজের অপুত্রক অবস্থা স্মরণ করিয়া নিতান্ত খিদ্যমান হইলেন। অপ্সরা সানুমতী আর রাজার কষ্ট সহ্য করিতে পারি-

লেন না। যাহাতে রাজা অচিরে স্ত্রীপুত্র লাভ করিয়া সুখী হন, তাহার চেষ্টা করিতে ও শকুন্তলাকে আশ্বাসদানের জন্য তিনি প্রস্থান করিলেন।

অতঃপর দেবাসুরের যুদ্ধ-সম্ভাবনা দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্র প্রিয়-সখা দুষ্মন্তকে স্বর্গলোকে লইয়া যাইবার জন্য রথ প্রেরণ করিলেন। ইন্দ্র-সারথি-মাতলি দেবকার্য্য-সাধনে আসিয়া দেখিলেন, রাজা বিরহে নিতান্ত কাতর। তদবস্থায় তাঁহাকে দেবরাজের আদেশ বিজ্ঞাপন করিলে ফললাভের সম্ভাবনা অল্প দেখিয়া তিনি রাজাকে উত্তেজিত করিবারনিমিত্ত বিদূষককে লইয়া শূন্যে উঠিলেন। বিদূষক "পরিত্রাহি" ডাক ছাড়িল। প্রিয়সখার আর্ত্তনাদ শুনিয়া দুষ্মন্ত স্থির থাকিতে পারিলেন না। ধনুর্ব্বাণ আনয়নের আদেশ করি-লেন। যবনী পরিচারিকাগণ সত্বর আয়ুধ লইয়া উপস্থিত হইল। রাজা যেমন শরসন্ধান করিবেন, অমনই ইন্দ্র-সারথি মাতলি বিদূ-ষককে পরিত্যাগ করিয়া রাজার সমীপে ইন্দ্রাদেশ নিবেদন করি-লেন। দুষ্মন্তও দেবকার্য্যসাধনে গমন করিলেন। মন্ত্রী রাজকার্য্য সম্পাদনের ভার পাইলেন।

এই অঙ্কে বিদূষক-চরিত্রের উজ্জ্বল অংশ চিত্রিত হইয়াছে। দ্বিতীয়াঙ্কে বিদূষকের যেরূপ হৃদয়হীনতা দেখা যায়, এ অঙ্কে সেরূপ নয়। বিদূষক রাজার দুঃখে দুঃখী যথার্থ সখার ন্যায় বিদূষক প্রতীয়-মান হইয়াছেন। রাজার বিশ্বাসের পাত্র বলিয়া বিদূষক মহিষী-গণের চক্ষুশূল। সর্ব্বদাই মহীষীগণকর্ত্তৃক বিদূষক নিগৃহীত হন।

সপ্তাঙ্ক—শকুন্তলাপ্রত্যাখ্যানের পর প্রায় ৪ বৎসর গত হইয়াছে। রাজা দুষ্মন্ত দেবকার্য্য-সাধন করিয়া দেবরথে স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে আগমন করিতেছেন। এই উপলক্ষে কবি

ব্যোমমার্গের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা অতীব চমৎকার। মনুষ্যকল্পনায় যে কিরূপ চিত্র চিত্রিত হইতে পারে, তাহা কালিদাস দেখাইয়াছেন। পূর্ব্বকালে আকাশপথে বিচরণ করিবার কোন উপায় ছিল অথবা পর্ব্বত শিখরে আরোহণ করিয়া পৃথিবীর অবস্থা অবলোকন করত, কবি এই প্রকার লিখিয়াছেন, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না; তবে স্বয়ং প্রত্যক্ষ না করিলে কে বলিতে পারেন যে, "পূর্ব্বে উচ্চে অবস্থানহেতু পৃথিবী পর্ব্বত-শিখরের সমদেশবর্ত্তিনী বোধ হইতেছিল, এক্ষণে নিম্নাবতরণহেতু শৈলাগ্রভাগ স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে ও পৃথিবী পর্ব্বতের অধোভাগে অবস্থিত বোধ হইতেছে। পূর্ব্বে বৃক্ষ সকল কেবল পত্ররাশি মাত্র বোধ হইতে-ছিল, এক্ষণে তাহাদের স্কন্ধ ও শাখা-প্রশাখা স্পষ্ট অনুভূত হইতেছে। পূর্ব্বে নদীগুলি রেখার ন্যায় বোধ হইতেছিল, এক্ষণে সুবিস্তীর্ণ আকার ধারণ করিয়াছে। দেখ, কোন ব্যক্তি যেন পৃথিবীকে উর্দ্ধভাগে ক্ষেপণ করিয়া আমার পার্শ্বে আনিয়া দিতেছে।"

মেঘ রাশির মধ্য দিয়া গমনকালে রথের গতি কিরূপ হইতে পারে, সে চিত্রও কালিদাসের কল্পনা বিক্রমোর্ব্বশীতে চিত্রিত করিয়াছে, অভিজ্ঞানেও তদনুরূপ বর্ণনা দেখা যায় ইহা যেরূপ হৃদয়গ্রাহিণী সেইরূপ কবিপ্রতিভার সুন্দর পরিচয় প্রদান করিতেছে।

অনন্তর দেবরথ তাপসগণের সিদ্ধিক্ষেত্র হেমকূট নামক পর্ব্বতের সমীপস্থ হইলে, রাজা ভগবান্ কশ্যপকে দর্শন ও বন্দনা করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। মাতলি রাজাকে মারীচা-শ্রমে (কশ্যপাশ্রমে) নামাইলেন। ভগবান্ কশ্যপ তখন অদি-

তিকে পাতিব্রত্যধর্ম্ম উপদেশ দিতেছিলেন। রাজা তাঁহার সাক্ষাৎ-লাভের জন্য অশোক-তরুমূলে অবস্থান করিলেন। মাতলি ভগবান কশ্যপকে রাজার আগমন সংবাদ জানাইতে গমন করিলেন। ইত্যবসরে দুইজন তাপসীর সহিত একটী বালক সিংহশিশু লইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে সেইখানে আগমন করিল। বালক সিংহশিশুর দন্ত গণিতে যাইতেছে, আশ্রমনিষিদ্ধ চপলতা দেখাইতেছে, তথাপি তাহাকে দেখিয়া রাজার মনে বাৎসল্যভাবের উদয় হইল। রাজা মনে করিলেন, তিনি অপুত্রক বলিয়া বালকের প্রতি তাঁহার স্নেহ জন্মিল। বালকের হস্তে রাজচিহ্ন দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। বালকটীর স্পর্শসুখ অনুভব করিতে, তাহাকে ক্রোড়ে লইতে তাঁহার অভিলাষ হইল। তাঁহার সহিত বালকের আকৃতিগত সাদৃশ্য ও তাঁহার নিকট বালকের প্রশান্ত-ভাব-ধারণ দেখিয়া তাপসীদ্বয় বিস্মিত হইলেন। অতঃপর রাজা বালকের পরিচয় জানিতে চাহিলে তাপসীরা কেহই বালকের ধর্ম্মপত্নিত্যাগী পিতার নাম করিতে চাহিলেন না; বালকটী পুরুবংশীয় ও অপ্সরা-সম্বন্ধে বালকের মাতা উক্ত আশ্রমে সন্তান প্রসব করিয়াছেন, এইমাত্র পরিচয় পাইয়া রাজা তাহার মাতার নাম জানিতে কৌতূহলী হইলেও পরদার-সম্বন্ধীয় প্রশ্ন অনুচিত মনে করিয়া, তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। কিন্তু তাপসীদ্বয় তাহা আপনা হইতে ব্যক্ত করিলেন। বালককে শকুন্তলাবণ্য দেখিতে বলায় সে "আমার মা কোথায়" বলিয়া উঠিল। তথাপি রাজার সন্দেহ দূর হইল না—নাম-সাদৃশ্য কত থাকিতে পারে। তৎপরে সিংহশাবক লইয়া খেলিবার সময় বালকের রক্ষাকরণ্ডক স্থানচ্যুত হয়। বালকের হস্তে তাহা না দেখিয়া তাপসীরা উদ্বিগ্ন

হইলেন রাজা তাহা কুড়াইয়া লইয়া যথাস্থানে পরাইয়া দিলেন। বালকের পিতা মাতা ভিন্ন আর কেহ উক্ত অপরাজিতা ঔষধের তাগা স্পর্শ করিলে বিষধর কর্ত্তৃক দংশিত হইবার কথা। কিন্তু রাজাকে ঐ রক্ষকরস্তক তুলিবার সময় সর্প দংশন না করায় তাপসীরা বুঝিলেন ইনিই রাজা দুষ্মন্ত। তাঁহাদের একজন শকুন্তলাকে এই বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিতে গমন করিলেন। বালকটীও তাঁহার অনুগমনে ইচ্ছুক হইয়া রাজাকে বলিল—"আমাকে ছাড়িয়া দাও, দুষ্মন্ত আমার পিতা তুমি নও"। বালকের কথায় রাজার বিশ্বাস বদ্ধমূল হইল যে বালক তাঁহারই ঔরস পুত্র।

অতঃপর বিরহকাতরা একবেণীধরা শকুন্তলা সেস্থানে উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বে অপ্সরা সানুমতীর মুখে তিনি সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া রাজা কিরূপ কষ্টে সময়ক্ষেপ করিতেছেন তাহা তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন। এক্ষণে রাজাকে উপস্থিত দেখিয়া তাঁহার চক্ষু যেন প্রত্যয় করিতে চাহিল না। রাজার মুখের কথা শুনিয়া তাঁহার বিশ্বাস হইল। রাজা শকুন্তলাকে দেখিয়া অনুনয়পূর্ব্বক প্রত্যাখ্যানরূপ নিষ্ঠুর আচরণ বিস্মৃত হইতে বলিলেন। শকুন্তলার চরণযুগল ধারণ করিলেন। পতিব্রতা শকুন্তলা কথা কহিবেন কি? চক্ষুজলে তাঁহার বক্ষস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল—বাষ্পভরে কণ্ঠরুদ্ধ হইল। তিনি ভূমিতল হইতে রাজাকে উঠিতে বলিলেন এবং কিরূপে রাজা তাঁহাকে মনে করিয়াছেন তাহাই জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা অঙ্গুরীয়কের কথা বলিলেন। অনন্তর মাতলি আসিয়া রাজা ও শকুন্তলাকে কশ্যপের নিকটে লইয়া

গেলেন। কশ্যপ তপঃপ্রভাবে দুর্ব্বাসার অভিশাপ বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন একণে রাজা ও শকুন্তলার মিলন হইলে কণ্বকে সে সংবাদ প্রেরণ করিলেন এবং রাজাকে বিবিধ প্রকারে আপ্যায়িত করিলেন। ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি কশ্যপ শকুন্তলাকে প্রবোধ দিয়া তাঁহাদিগকে দুষ্মন্তসহ রাজধানীতে পাঠাইলেন। তাঁহার নিকট অভিশাপ বৃত্তান্ত প্রকাশ করার উদ্দেশ্য এই যে, রাজার প্রতি শকুন্তলার মনে যেন কোন বিপরীত ভাব না থাকে। বস্তুতঃ রাজার দোষ নাই শকুন্তলাকে এরূপ না বুঝাইতে পারিলে শকুন্তলা রাজাকে অন্তরের সহিত ক্ষমা করিতে পারেন না। রাজা ক্ষমা চাহিয়াছেন বটে। কিন্তু ক্ষমা চাওয়া যত সহজ ক্ষমা করা তত সহজ নহে। এই নাটকে দুইজন মহর্ষির চিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে। উভয়ের আশ্রমও চিত্রিত হইয়াছে। কণ্বের তপোবন শান্তিনিকেতন। চিরকৌমারব্রত অবলম্বন করিয়া মহর্ষি কণ্ব দুষ্কর তপশ্চরণ দ্বারা মুক্তিলাভের চেষ্টা করিতেছেন। আর সুরাসুর পিতা ভগবান মারীচ সিদ্ধভূমিতে সস্ত্রীক বাস করিয়া আশ্রমধর্ম্মের অর্থাৎ স্ত্রীগণের পতিসেবা প্রভৃতি কর্ত্তব্য বিষয়ের উপদেশ দিতেছেন। বৃদ্ধ কশ্যপের সিদ্ধিলাভ হইয়াছে। প্রার্থনীয় আর কিছুই নাই। কাজেই সৃষ্টি রক্ষা বিষয়ে এবং মানব জাতির হিতের জন্য তিনি চিন্তা করিতেছেন। মহর্ষি কাশ্যপের (কণ্বের) তখনও সিদ্ধি লাভ ঘটে নাই। সেইজন্য সংসারধর্ম্মে তিনি উদাসীন। পরহিতচেষ্টা উভয়েরই লক্ষ্য, কিন্তু কণ্বের নিজ কর্ত্তব্য তপশ্চরণাদিতে অবহেলা করিয়া সে কার্য্য করিতে পারেন না। বৃদ্ধ কশ্যপ সতত জগৎবাসীর মঙ্গল সাধনে তৎপর।

এইস্থানে কণ্বশিষ্য শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত সম্বন্ধে কিছু বলা আব-

শ্যক। শিষ্যদ্বয় যুবক। শার্ঙ্গরব উগ্রস্বভাব, শারদ্বত বিনয়ী। লোকচরিত্রজ্ঞান উভয়েরই অল্প। সেইজন্য তাঁহারা সাংসারিক লোককে তাদৃশ শ্রদ্ধার পাত্র মনে করেন না। উভয়ে আত্মমর্যাদা সম্পন্ন। কর্ত্তব্য-বোধে দুষ্মন্তের ন্যায় প্রকৃতিরঞ্জক রাজাকেও দুকথা শুনাইতে কেহ ভীত নহেন। তবে শার্ঙ্গরব যেরূপ কোপ-পরায়ণ শারদ্বত তাহা নহেন। তিনি ধীরতার সহিত কার্য্যোদ্ধার করিতে প্রয়াসী। উভয়েই-ন্যায় পক্ষপাতী। রাজার অন্যায়াচরণ দেখিয়া শার্ঙ্গরব কঠোর বাক্য ব্যবহার করিলেন। শারদ্বত প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন। শারদ্বত কথা কহিলেন না। আর্য্যা গৌতমী প্রবীণা, লোকচরিত্রাভিজ্ঞা, এবং নিরতিশয় বুদ্ধি-মতী। যদিও শকুন্তলার বিরহাবস্থার রোগ নির্ণয়ে তিনি সমর্থা হন নাই তথাপি তাঁহার বিচক্ষণতা প্রশংসনীয়া। নবীনাদিগের কর্ত্তৃক প্রবীনারা প্রতারিত হইয়া থাকেন। বিরহতাপ বুঝিবার সময় তাঁহাদের অতীত হইয়াছে। যাহা হউক রাজ-সভায় যখন তিনি শার্ঙ্গরবের ন্যায় বৃথা কথা না কহিয়া শকুন্তলার অবগুণ্ঠন মোচন করিলেন তখন তাঁহার বুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। যে সামগ্রী যে লোক ভোগ করে সে তাহা দেখিলে অবশ্যই চিনিবে। সুতরাং বৃথা বিতণ্ডা না করিয়া তিনি দুষ্মন্তের প্রত্যয় জন্মাইবার জন্য শকুন্তলার মুখাবরণ খুলিয়া দিলেন। অতঃপর মাতৃভাবে রাজাকে যখন তিনি বলিলেন শকুন্তলা গুরুজনের অপেক্ষা করেন নাই, রাজাও শকুন্তলার অথবা নিজ বন্ধুজনকে জানান নাই তখন রাজাকে মৃদু তিরস্কার করা হইল যে তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির লোক জানাইয়া কার্য করা উচিত ছিল। রাজা শকুন্তলাকে অসত্যবৃত্তা বলিলে তিনি

কেবলমাত্র বলিলেন—"মহাভাগ, এ ব্যক্তি তপোবনে সম্বর্দ্ধিত হইয়াছে, কৈতব জানে না। ইহাকে এরূপ বলা অনুচিত।" কিন্তু রাজা তাহা না শুনিয়া কঠোরতর ভাষায় শকুন্তলাকে সম্বোধন করিলে গৌতমী আর কোন কথা কহিয়া আত্ম-মর্য্যাদা নষ্ট করিলেন না। শার্ঙ্গরব প্রভৃতি গমনোদ্যত হইলে শকুন্তলা যখন তাঁহাদের পশ্চাদনুসরণ করেন তখন গৌতমীর মন স্নেহার্দ্র হইল। তিনি শকুন্তলাকে সঙ্গে লইতে চাহিলেন। রোদনপরায়ণা শকুন্তলা প্রত্যাখ্যাতা হইয়া স্বামীসমীপে থাকিয়া কি করিবে ভাবিয়া তিনি তাহাকে সঙ্গে লইতে চাহিলে কণ্বশিষ্যগণ তাহা করিতে দিলেন না। গৌতমী এতদিন শকুন্তলাকে কন্যার ন্যায় লালন পালন করিয়াছেন। তিনিই শকুন্তলার মাতৃস্বরূপা। শকুন্তলার ভাগ্যবিপর্য্যয় তাঁহার নিরতিশয় চিত্তক্লেশ জন্মিল। তথাপি স্বামীগৃহে দাস্য ও ভাল বিবেচনা করিয়া তিনি শকুন্তলাকে সঙ্গে লইতে পারিলেন না। ঋষিপত্নীগণ এমনই কঠোর কর্ত্তব্য-পরায়ণ।

অভিজ্ঞান শকুন্তলে নিয়তির খেলা সুন্দররূপে দেখান হইয়াছে। কার্য্যবিশেষের দ্বারা ফললাভ করা যে মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। নহিলে একমাত্র অঙ্গুরীয়ক হইতে এতটা ব্যাপার ঘটিবে কেন? যে রাজা মাস কয়েক পূর্ব্বে শকুন্তলাকে সসাগরা পৃথিবীর সপত্নী করিবেন বলিয়া আশ্বাসিতা করিয়াছিলেন তিনিই নিদর্শন না দেখিতে পাইয়া এতদূর আত্মবিস্মৃত হইবেন ইহা শকুন্তলা বুঝিবেন কিরূপে? শকুন্তলা যদি জানিতেন যে অঙ্গুরীয়ক হইতে অনিষ্ট উৎপত্তি হইবে তাহা হইলে তিনি সেটী কে প্রাণাপেক্ষা যত্নে রাখিতেন না? যাহা হউক রাজার

ব্যবহার তাঁহার নিকট নিতান্ত বিসদৃশ, নিরতিশয় কঠোর বিবেচিত হইয়াছিল। রাজাকে ক্ষমা করাও তাঁহার পক্ষে সহজ হইত না। হিন্দুমহিলা স্বামীর মঙ্গলাভিলাষিণী হইলেও তাঁহার নিষ্ঠুর ব্যবহার সহজেই বিস্মৃত হইতে পারিবেন কিরূপে? রাজার ক্ষমা ভিক্ষা করা যত সহজ শকুন্তলার ক্ষমা করা তত সহজ নহে। ক্ষমা চাহিলেই কি ক্ষমা করা (অন্তরের সহিত ক্ষমা করা) যায়? সেইজন্য ভগবান্ কশ্যপ দুর্ব্বাসার অভিশাপ বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া রাজার দোষ ক্ষালন করিলেন। প্রতিকূল দৈব তাঁহাকে বিড়ম্বিত করিয়াছে ইহা বুঝাইয়া মহর্ষি কশ্যপ শকুন্তলাকে আশ্বস্ত করিলেন।

সংস্কৃত নাটকের প্রথমে যেরূপ মঙ্গলাচরণ থাকে সমাপ্তকালেও সেইরূপ আশীর্ব্বচন প্রয়োগ দেখা যায়।

বিক্রমোর্ব্বশী।

অভিজ্ঞান শকুন্তলের ন্যায় বিক্রমোর্ব্বশীও কালিদাসের অলৌকিক কবিত্বশক্তির সম্পূর্ণ পরিচয় প্রদান করিতেছে। আলঙ্কারিকেরা এখানিকে নাটক না বলিয়া ত্রোটক বলিয়া থাকেন। এরূপপ বলিবার কারণ এই যে অমানুষী নায়িকা (অপ্সরা উর্ব্বশীকে) অবলম্বন করিয়া এই নাটক লেখা হইয়াছে। চন্দ্রবংশীয় আদি রাজা পুরুরবা ইহার নায়ক। পুরুরবা ও উর্ব্বশী বিষয়ক পৌরাণিকী আখ্যায়িকা হইতে কবি এই নাটক রচনা করিয়াছেন। কিন্তু নিজ উদ্ভাবিনী শক্তি বলে উক্ত আখ্যায়িকা এরূপ নূতন আকারে প্রদর্শন করিয়াছেন যে বিক্রমোর্ব্বশী অতি উৎকৃষ্ট অতি উপাদেয় সামগ্রী হইয়াছে।

বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশে দেখা যায় যে ভগবান মিত্রাবরুণের শাপে উর্ব্বশী ধরাধামে অবতরণ করেন। সেই সময় রাজা পুরুরবা গঙ্গাযমুনা সঙ্গমস্থলের নিকট প্রতিষ্ঠান নগরে প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি যেরূপ বিক্রমশালী সেইরূপ দেহশ্রীসম্পন্ন ছিলেন। উর্ব্বশী তাঁহার অলোকসামান্য রূপদর্শনে মুগ্ধা হইয়া তাঁহার প্রতি অনুরাগিনী হন। রাজাও তাঁহার রূপলাবণ্যে আকৃষ্ট হইলেন। রাজা তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহিলে উর্ব্বশী রাজাকে তিনটী প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করিলেন। প্রথমতঃ শয্যাপার্শ্বে উর্ব্বশীর পুত্রভূত দুইটী মেষশাবক থাকিবে তাহা কেহ হরণ করিলে তিনি রাজাকে ত্যাগ করিবেন। দ্বিতীয়তঃ রাজাকে নগ্ন অবস্থায় দেখিলে তিনি রাজার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিবেন। তৃতীয়তঃ ঘৃত ভিন্ন কোন দ্রব্য আহার করিবেন না। রাজা প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইয়া উর্ব্বশীর সহিত কখনও বা অলকায়, কখনও চৈত্ররথ প্রদেশে কখনও বা মানসাদি তীর্থস্থানে বিহার করিতে লাগিলেন। এইরূপে ষষ্ঠি সহস্র বৎসর গত হইল।

এদিকে স্বর্গলোকে উর্ব্বশীর অভাব অনুভূত হইতে লাগিল। দেবসভায় উর্ব্বশীর সর্ব্বদা প্রয়োজন। সুতরাং তাহাকে ধরাধাম হইতে লইবার জন্য গন্ধর্ব্ব বিশ্বাবসু অন্যান্য গন্ধর্ব্বদিগের সহিত মিলিত হইয়া নিশীথ সময়ে উর্ব্বশীর শয্যাপার্শ্ব হইতে একটী মেষ অপহরণ করিলেন। মেষের আর্ত্তনাদে উর্ব্বশী অধীর হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে অপর মেষটীও অপহৃত হইল। রাজা অসংযত অবস্থায় ছিলেন। নিজ প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া শয্যাত্যাগ করিতে সাহসী হইলেন না। উর্ব্বশী কাঁদিয়া বলিলেন নিতান্ত কাপুরুষের হস্তে পড়িয়াই তাঁহার এই দুর্গতি

হইল। ইহা শুনিয়া ক্ষত্রিয় রাজা স্থির থাকিতে পারিলেন না। শয্যা ত্যাগ করিয়া যেমন উঠিলেন অমনই গন্ধর্ব্বমায়ায় বিদ্যুৎ চমকিল। উর্ব্বশী রাজাকে নগ্ন দেখিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। কার্য্যসিদ্ধ হইয়াছে দেখিয়া গন্ধর্ব্বগণ মেষ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। রাজা মেষ লইয়া আসিয়া দেখেন উর্ব্বশী নাই তখন তাঁহার প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ হইল। তিনি অসংযত অবস্থায় ছিলেন। সেই বেশেই পুরত্যাগ করিয়া উন্মত্তের ন্যায় নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। একদিন কুরুক্ষেত্রের নিকট অপ্সরস-তীর্থে উর্ব্বশীকে অন্যান্য অপ্সরার সহিত বিহার করিতে দেখিয়া রাজা তাঁহার নিকট সহবাস প্রার্থনা করিলেন। উর্ব্বশী তখন রাজার সহবাসে গর্ভবতী ছিলেন এজন্য রাজাকে বৎসরান্তে সেই স্থানে যাইতে বলিলেন। যথাসময়ে রাজা তথায় গমন করিলে উর্ব্বশী তাঁহার সহিত একরাত্রি বাস করিয়া তাঁহার পুত্র তাঁহাকে প্রদান করিলেন। রাজার সহবাসে উর্ব্বশী পুনরায় গর্ভিনী হইয়া পাঁচ পুত্র প্রসব করেন। গন্ধর্ব্বগণ রাজার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বরদান করিতে চাহিলে রাজা চিরদিন উর্ব্বশীর সহিত অবিচ্ছেদে বাস করিবার বর চাহিলেন। তথাস্তু বলিয়া গন্ধর্ব্বগণ তাঁহাকে একটী অগ্নিস্থালী প্রদান করিয়া বলিলেন যে, স্থালীতে যে অগ্নি ছিল বেদবিধি অনুসারে তাহা তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া যজ্ঞ করিলে রাজা উর্ব্বশীর সালোক্য প্রাপ্ত হইবেন।

সেই স্থালী পাইয়া রাজা গৃহে চলিলেন। পথিমধ্যে মনে করিলেন উর্ব্বশীর পরিবর্ত্তে একটা স্থালী কি হইবে সুতরাং তাহা বনে নিক্ষেপ করিলেন। রাত্রি দুই প্রহরের সময় পুনরায় সেই স্থালী আনয়নের জন্য গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। কিন্ত অগ্নি-

স্থালী পাইলেন না। যে স্থানে স্থালী নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল সেখানে একটী শমীগর্ভ অশ্বত্থ বৃক্ষ জন্মিয়াছিল। সেই অশ্বত্থ শাখা গ্রহণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা অরণী নির্ম্মাণ করিলে তাহার ঘর্ষণে অগ্নি উৎপাদিত হইল। সেই অগ্নি তিনভাগে বিভক্ত করিয়া রাজা তদ্দ্বারা যজ্ঞ করিলেন। এবং উর্ব্বশীর সলোকতা লাভ করিলেন। তদবধি অগ্নি তিনভাগে বিভক্ত হইল।

ঋগ্বেদে ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে পুরুরবার নাম পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ অঙ্গিরা ও ভৃগুর ন্যায় তিনিও প্রথমে অগ্নির ব্যবহারকার্য্য শিক্ষা করেন। যাহা হউক পুরাণবর্ণিত পুরুরবাও উর্ব্বশীর উপাখ্যান কালিদাসের হস্তে কিরূপ শোভা ধারণ করিয়াছে তাহা দেখা যাউক।

প্রথমাঙ্ক—কোন সময় উর্ব্বশী সখীসঙ্গে কুবের ভবন হইতে প্রত্যাগমন সময়ে কেশী নামক দুর্দ্দান্ত-অসুর কর্ত্তৃক অপহৃতা হইলে তাঁহার সঙ্গিনীগণ রোদন করিতে লাগিলেন। সেই সময় রাজা পুরুরবা সূর্য্যোপাসনা করিয়া আসিতেছিলেন। রমণীগণের আর্ত্ত-নাদ শ্রবণে সত্বরতার সহিত তিনি তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার নিকট উর্ব্বশীর সখীগণ উর্ব্বশীর দুরবস্থার কথা বলিলে তিনি বিমানমার্গে দস্যুর পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। তাঁহার রথের গতি অপ্রতিহত ছিল। মেঘস্তরের মধ্য দিয়া গমনকালে রথের সম্মুখস্থ মেঘ সকল পশ্চাৎ ভাগে নিক্ষিপ্ত হইয়া ধূলির ন্যায় দেখাইতে লাগিল। রথের বেগাতিশয্য বশতঃ রথকেতন নিচলভাব ধারণ করিল। এইরূপে দ্রুতবেগে রথ চালাইয়া রাজা শীঘ্রই দৈত্যহস্ত হইতে উর্ব্বশী ও তাঁহার সখী চিত্রলেখাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইলেন। উর্ব্বশীর অন্যান্য সখীগণ হেমকূট শিখরে রাজার প্রত্যা-

গমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। উর্ব্বশীর প্রিয়সখী রম্ভা তাঁহার বিরহে এতই অধীরা হইয়াছিলেন যে মহাবল রাজা পুরুরবার বিক্রমের প্রতিও তাঁহার সন্দেহ জন্মিতেছিল। এবং উর্ব্বশীকে আর দেখিতে পাইবেন না ভাবিয়া তিনি আকুল হইয়াছিলেন।

এদিকে উর্ব্বশী দৈত্যহস্তে পতিত হইয়াই ভয়ে মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলেন। রাজা তাঁহার উদ্ধার সাধন করিলেও তাঁহার সংজ্ঞালাভ হয় নাই। পুরুরবা তাঁহাকে ও সখী চিত্রলেখাকে নিজ রথে লইয়া আসিবার সময় চিত্রলেখার আশ্বাস বাক্যে তাঁহার ক্রমশঃ চৈতন্যলাভ হইল। তিনি কৃতজ্ঞ চিত্তে উদ্ধারকর্ত্তা রাজাকে দেখিতে লাগিলেন। আগে রাজার বিক্রম, তৎপরে অলৌকিক রূপ, এবং অমৃতময় বচন শুনিয়া উর্ব্বশী মুগ্ধ হইলেন। তাঁহার হৃদয়, মন রাজার দিকে আকৃষ্ট হইল। তিনি অনিমিষলোচনে রাজার রূপ-সুধা পান করিতে লাগিলেন। সখী চিত্রলেখা উর্ব্বশীর ভাব দেখিয়া বুঝিতে পারিল রাজার প্রতি উর্ব্বশী অনুরাগিনী হইয়াছেন। তাই পরিহাস করিয়া বলিল "সখি কি দেখিতেছ" উর্ব্বশী উত্তর করিলেন "যে ব্যক্তি সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী, নয়নদ্বারা তাহাকেই পান করিতেছি।" চিত্রলেখা বলিলেন-"সে কে" ? উর্ব্বশী উত্তর করিলেন "প্রণয়িজন।"

ইত্যবসরে রথ আসিয়া হেমকূট শিখরে উপস্থিত হইল। রথাবতরণ সময়ে ভীত হইয়া উর্ব্বশী রাজাকে ধরিলেন। কিন্তু লজ্জিত হইয়া চিত্রলেখার হস্তধারণ পূর্ব্বক রথ হইতে নামিয়া সখীগণের সহিত মিলিতা হইলেন। অপ্সরাগণ রাজাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। এইরূপ শিষ্টাচার বিনিময়ের সময় গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথ সেখানে আগমন করিলেন এবং তাঁহার সহিত ইন্দ্রসভায় উপ-

স্থিত হইবার জন্য রাজাকে অনুরোধ করিলেন। রাজা লজ্জাবশতঃ সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি রাজধানী গমনে প্রবৃত্ত হইলে উর্ব্বশী নিজে রাজার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারিলেন না। চিত্রলেখাকে দিয়া রাজার নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইলেন। তাঁহার মন কিন্তু পড়িয়া রহিল রাজার নিকটে।

উর্ব্বশীকে দর্শনাবধি রাজারও চিত্তস্থির ছিল না। যখন উর্ব্বশীকে উদ্ধার করিয়া রাজা নিজ বক্ষে তাঁহাকে উঠাইয়া লইয়াছেন—সংজ্ঞাশূন্য উর্ব্বশীকে দেখিয়া সখী চিত্রলেখা নিতান্ত কাতরা হইয়া উর্ব্বশীর জীবনের প্রতি আশঙ্কা করিতেছেন, তখন রাজার দৃষ্টি উর্ব্বশীর অনিন্দ্য পয়োধরযুগলের উপর পতিত মন্দারমালার কম্পন দ্বারা উর্ব্বশীর হৃৎকম্পের অবস্থা দর্শন করিতেছে। উর্ব্বশীকে আশ্বস্ত করিবার জন্য তাঁহার সুদুর্লভ রূপরাশির কথা তুলিয়া রাজা তাঁহাকে তাঁহার সখীজনের উৎকণ্ঠার কথা বলিতেছেন। অতঃপর রথাবতরণের সময় উর্ব্বশী তাঁহাকে স্পর্শ করিলে রাজা মনে করিলেন যে তাঁহার মানুষজন্ম সফল হইল। প্রস্থান কালে উর্ব্বশী যখন বৈজয়ন্তীমালা লতাবিটপে লগ্ন হইয়াছে বলিয়া সস্পৃহনয়নে রাজাকে দেখিতে লাগিলেন তখন রাজা পুনরায় তাঁহার মুখ দেখিতে পাইয়া অতিশয় আনন্দলাভ করিলেন। তিনি বলিলেন "সুরাঙ্গনা কর্ষতি খণ্ডিতাগ্রাৎ, সূত্রং মৃণালাদিব রাজহংসী।"

প্রথমাঙ্কে রাজা ও উর্ব্বশীর পরস্পরের প্রতি প্রণয়চিহ্ন প্রকাশ পাইল। কিন্তু পুরুরবা মর্ত্ত্যমানব। তাঁহার পক্ষে সুরাঙ্গনালাভ ঘটিবে, বিশেষতঃ যে উর্ব্বশীকে সর্ব্বদা দেবরাজের নিয়োগমতে তাপসগণের ধ্যানভঙ্গ করিতে হয়, দেবসভায় নৃত্যগীতাদির দ্বারা

সুরগণের তুষ্টিসাধন করিতে হয়; যিনি স্বর্গে রমণীগণের সাররত্ন, রূপে ও গুণে সকল অপ্সরা হইতে যিনি শ্রেষ্ঠা, তাঁহাকে সহজে যে লাভ করিতে পারেন অথবা তাঁহার ন্যায় মানবের উপর তিনি অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে পারেন এ চিন্তা তখনও রাজার মনে প্রবল হইতে পারে না।

দ্বিতীয়াঙ্ক—রাজা সূর্য্যোপাসনা করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকে সর্ব্বদা অন্যমনস্ক দেখিয়া রাজ্ঞী ঔশীনরী নিতান্ত উদ্বিগ্না হইয়াছেন। রাজা মহিষীর নিকট রহস্যভেদ করেন নাই। একমাত্র প্রিয় সহচর বিদূষকের নিকট মনোবেদনা প্রকাশ করিয়াছেন। বিদূষক জাতিতে ব্রাহ্মণ ও রাজার সখা হইলেও রহস্য গোপন রাখিবার লোক নহে। সে ক্ষমতা তাহার নাই। সে ভাঁড়ামি করিয়া রাজার মনস্তুষ্টি করে বটে কিন্তু সাংসারিক বুদ্ধি তাহার নাই বলিলেও হয়। সে রাজার ব্যথার ব্যথী নহে। বরং রাজার অন্যাসক্তিতে সে বিরক্ত। বিদূষক মিষ্টান্নলাভে তৃপ্ত হয়। তাহার মন পড়িয়া থাকে রন্ধনশালায়। তাহার ইচ্ছা যিনি যে কয়দিন পৃথিবীতে থাকিবেন মনের সুখে আহার ও বিহার করেন। প্রেমাসক্তি সে বুঝে না কেননা সে সংসারের ধার ধারে না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এরূপ লোকের নিকট রাজারা বিশ্বাস করিয়া রহস্যভেদ কেন করিতেন বুঝিতে পারা যায় না। রাজার কি অন্যলোকের সহিত বন্ধুত্ব ঘটিত না? না রাজারা সেরূপ পাত্র পাইতেন না? আমাদের সময়েও রহস্য-পটু লোক ধনীলোকের প্রিয়পাত্র হইয়া থাকেন দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মনের কথা ত কেহ সে সকল লোকের নিকট প্রকাশ করেন না।

যাহা হউক বিদূষকের নিকট উর্ব্বশীর কথা ব্যক্ত করিয়া রাজা কতকটা শান্তিলাভ করিবার আশা করিয়াছিলেন কিন্তু হিতে বিপরীত হইল। মহিষী ঔশীনরীর পরিচারিকা নিপুণিকা কৌশল-ক্রমে বিদূষকের নিকট হইতে রাজার উর্ব্বশীর প্রতি আসক্তির কথা অবগত হইল। অনন্তর রাজা যখন বিদূষকের সহিত মিলিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বয়স্য রহস্য প্রকাশ কর নাই ত?" তখন নিপুণিকা কর্ত্তৃক প্রবঞ্চিত হইয়াছে দেখিয়া বিদূষক উত্তর করিল—"আমি এতদূর জিহ্বা সংহত করিয়া রাখিয়াছি যে আপনার প্রশ্নেরও উত্তর দিতেছি না।" রাজা বিদূষককে লইয়া প্রমোদবনে গমন করিলেন ও উর্ব্বশীবিষয়ক কথায় চিত্তবিনোদন করিতে লাগিলেন। বিদূষক ব্রাহ্মণত্ব ফলাইয়া শীঘ্রই রাজার মনোভীষ্ট সিদ্ধ হইবে এরূপ আশ্বাস দিতে লাগিল। রাজাও কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন। কালিদাস এইখানে স্বভাবের শোভা বর্ণনার অবসর পাইয়াছেন। বসন্তের আবির্ভাবে প্রমোদবন কিরূপ শোভা ধারণ করে তাহা দেখাইতে কবি ভুলেন নাই।

এদিকে রাজার বিরহে উর্ব্বশী নিতান্ত অধীরা হইয়া সখী চিত্রলেখার সহিত আকাশপথে প্রমোদবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা যে তাঁহার প্রতি নিতান্ত আসক্ত হইয়াছেন তাহা তিনি জানিতেন না। অন্তরালে থাকিয়া রাজা ও বিদূষকের কথোপকথন প্রচ্ছন্নভাবে শুনিতে লাগিলেন। অতঃপর রাজা যখন নিরাশ হৃদয়ে, ভগ্নমনে বলিলেন—"এক্ষণে পঞ্চবাণ আমার প্রাণ বিনাশ করুন," তখন উর্ব্বশী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ভূর্জ্জপত্রে নিজ প্রেমসূচক অক্ষর লিখিয়া রাজার সমীপে নিক্ষেপ করিলেন। পত্রে লেখা ছিল—"স্বামিন্, আপনি যেরূপ

আমাকে কঠিনহৃদয় ও আপনার মানসিক পীড়ানভিজ্ঞা মনে করিতেছেন, আমিও আপনাকে সেইরূপ অনভিজ্ঞ মনে করিতেছি। আপনার বিরহে আমার পারিজাত শয্যা ও নন্দনবনবায়ুও অগ্নিবৎ বোধ হইয়া থাকে।" রাজা পত্রপাঠান্তে যৎপরোনাস্তি হর্ষলাভ করিলেন। এবং বিদূষককে সেই পত্র রক্ষা করিতে বলিলেন পাছে তাঁহার অঙ্গুলির স্বেদজলে পত্রস্থ অক্ষরগুলি বিলুপ্ত হয়। উর্ব্বশী তখনও রাজার সমীপস্থ হইতে পারিলেন না। তাঁহার হৃদয়ের আবেগ এতই গুরুতর হইয়াছিল। সেজন্য প্রথমতঃ সখী চিত্রলেখাকে রাজার সমীপস্থ হইতে অনুরোধ করিলেন। চিত্রলেখা রাজার নিকট উর্ব্বশীর মনোগত ভাব ব্যক্ত করিলেন। রাজার গভীর মনোবেদনা বুঝিয়া ক্রমে উর্ব্বশীও রাজাকে দর্শন দিলেন। রাজা তাঁহার হস্তধারণ করিয়া আসনে বসাইলেন। কিন্তু তাঁহাদের মিলন অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। অবিলম্বে দেবদূত আসিয়া সংবাদ জানাইল যে দেবসভায় মহর্ষি ভরতপ্রণীত লক্ষ্মীস্বয়ম্বর নামক নাটক অভিনীত হইবে। উর্ব্বশী লক্ষ্মীচরিত্রের অভিনয় করিতে নিযুক্তা ছিলেন। দেবরাজের আদেশ শুনিয়া আর বিলম্ব করিতে পারিলেন না। তাঁহাদের প্রস্থানকালে রাজা বলিলেন—"আমাকে স্মরণ রাখিবেন"।

এ দিকে বিদূষকের হস্ত হইতে ভূর্জ্জপত্র পড়িয়া গিয়াছে। বিদূষক রাজাকে তাহা বলিতে সাহসী হইলেন না। রাজা যখন তাহা দেখিতে চাহিলেন তখন বিদূষক বলিল—"মহারাজ সে ভূর্জ্জপত্র স্বর্গীয়, অতএব তাহা সঙ্গেই গিয়াছে।" রাজা বিরক্ত হইয়া তাহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন।

রাজ্ঞী ঔশীনরী মহারাজের হৃদয়বেদনার কথা পরিচারিকার

মুখে শুনিয়া সহসা বিশ্বাস করিলেন না। স্বচক্ষে প্রমোদবনস্থিত রাজার অবস্থা দর্শন করিতে আসিলেন। ইত্যবসরে বিদূষকের হস্তভ্রষ্ট ভূর্জ্জপত্র পবনবেগে বাহিত হইয়া মহিষীর নূপুরে লগ্ন হইল। নিপুণিকা পত্রপাঠ করিয়া মহিষীকে শুনাইল। মহিষী পত্র শুনিয়া স্বচক্ষে রাজার অবস্থাদর্শনে গমন করিলেন এবং দেখিলেন, রাজা তখনও ভূর্জ্জপত্রের অন্বেষণ করিতেছেন। মহিষী রাজার বিলাপ শুনিয়া ও অধীরতা দেখিয়া রাজাকে সেই ভূর্জ্জপত্র প্রদান করিলেন। বিদূষক বলিল—"লুণ্ঠিত দ্রব্যসহ চোর ধৃত হইয়াছে"। রাজা দেবীকে প্রসন্না করিবার চেষ্টা করিলেন। তাঁহার পদযুগল ধারণ করিলেন। কিন্তু দেবী ক্রোধভরে সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। রাজা বুঝিলেন যে অনুরাগভিন্ন কেবলমাত্র অনুনয়ে কোন ফল না। কিন্তু দেবী যে তাঁহার অবমাননা করিয়া গেলেন ইহাতে রাজা অসন্তুষ্ট হইলেন। যাহা হউক অধিক বেলা ও স্নান ভোজনের সময় প্রায় অতিক্রান্ত হওয়ায় রাজা বয়স্যসহ সেস্থান ত্যাগ করিলেন।

তৃতীয়াঙ্ক—এই অঙ্কের প্রথমে আমরা জানিতে পারি যে দেবসভায় লক্ষ্মীস্বয়ম্বর নাটকের অভিনয় হইয়া গিয়াছে। উর্ব্বশী লক্ষ্মী ও মেনকা বারুণী সাজিয়াছিলেন। কিন্তু উর্ব্বশী অভিনয়-কার্য্যে প্রমাদ ঘটাইছেন। অভিনয়কালে পুরুষোত্তম নাম না বলিয়া পুরুরবার নাম করিয়া উর্ব্বশী নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। নাট্যাচার্য্য মহর্ষি ভরত তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া উর্ব্বশীকে অভিশাপ দিয়াছেন—"তোমার দিব্যজ্ঞান লোপ পাইবে"। ইন্দ্র উর্ব্বশীকে প্রিয়সুহৃদ ও রণসহায় পুরুরবার প্রতি আসক্তা জানিয়া বলিয়াছেন—"যত দিন রাজার সহবাসে তোমার

সন্তান না হয়, তত দিন তুমি তাঁহার প্রিয়সাধন করিবে"। এই সংবাদ কবি ভরতশিষ্যগণের কথোপকথন দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন।

এদিকে মহিষী ঔশীনরী রাজার প্রতি অবজ্ঞাপ্রদর্শন করিয়া মানভরে চলিয়া যাওয়ার পর মান পরিত্যাগ করিয়া পরিচারিকা-দ্বারা রাজাকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে তিনি কোন ব্রত-সম্পাদনে অভিলাষিণী হইয়াছেন। এক্ষণে কঞ্চুকীদ্বারা মহারাজের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যে সন্ধ্যার পর মহিষী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন এবং চন্দ্ররোহিণীযোগে মণিহর্ম্ম্যপৃষ্ঠে রাজার অর্চ্চনা করিয়া ব্রত সমাপন করিবেন। রাজা সাদরে মহিষীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। রাজা ও বিদূষক মহিষীর ব্রতের কারণ অবগত ছিলেন না। তাই নানারূপ জল্পনা কল্পনা করিতে লাগিলেন। বিদূষকের মনে হইল মহিষী রাজার প্রণিপাত লঙ্ঘন করিয়া সন্তাপিত হইয়াছেন এবং সেইজন্যই ব্রতের আয়োজন করিয়াছেন। রাজারও তাহাই ধারণা হইল। অনন্তর উভয়েই মণিহর্ম্ম্যপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। তখনও চন্দ্রোদয় হয় নাই। পূর্ব্বদিক তিমিরনির্ম্মুক্ত হইয়া অল্প লোহিত আভা ধারণ করিয়াছে মাত্র। এইস্থলে কবি চন্দ্রোদয়ের অতি সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন।

অতঃপর বিদূষকের সহিত রাজা নিজ হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। উর্ব্বশীর আর কোন সংবাদ না পাইয়া তিনি যে নিতান্ত কাতর হইয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিলে বিদূষক তাঁহাকে আশ্বাস দিতে লাগিল। উর্ব্বশীর তাদৃশ ভাব দেখিয়া যে আশাবন্ধন দ্বারা ধৈর্য্য ধারণ করা যাইতে পারে তাহা বুঝাইল। তাঁহাদের এরূপ কথোপকথন চলিতেছে এমন সময় আকাশপথে উর্ব্বশী ও চিত্রলেখা আবির্ভূতা হইলেন। উর্ব্বশীর অভিসারিকা-

বেশ দেখিয়া চিত্রলেখার ইচ্ছা হইল যে, তিনিই তখন পুরুরবা হন। উর্ব্বশী সখীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজা তখন কি করিতেছেন। চিত্রলেখা যথাউত্তর করিলে উর্ব্বশীর ইচ্ছা হইল পুনরায় প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া রাজা ও বিদূষকের কথোপকথন শ্রবণ করেন।

রাজা ও বিদূষক তখন উর্ব্বশীবিষয়ক কথাতেই ব্যস্ত ছিলেন ; রাজা চন্দ্রকিরণ সেবন করিয়া অধিকতর সন্তাপিত হইতেছিলেন। কুসুমশয্যা, মণিহার, মলয়বায়ু প্রভৃতি যে, তাঁহার পীড়া শান্তি না করিয়া বৃদ্ধি করিতেছে তাহাই রাজা বলিতেছিলেন। কিরূপে উর্ব্বশীর অঙ্গস্পর্শে তাঁহার অঙ্গ শীতল হইয়াছিল ইত্যাদি কথার আলোচনায় পুরুরবা সময়ক্ষেপ করিতেছিলেন। তৎশ্রবণে উর্ব্বশী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তৎক্ষণাৎ রাজার সহিত মিলিত হইতে ইচ্ছুক হইলেন। কিন্তু মহিষী ঔশীনরী আসিয়া তথায় উপস্থিত হওয়ায় তাহা পারিলেন না।

মহিষী শুভ্রবস্ত্র পরিধান, ব্রতোপযোগী পুষ্পমালা ধারণ ও মাঙ্গলিক আভরণে সজ্জিত হইয়া আসিয়াছিলেন। উর্ব্বশীও তাঁহার রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। তাঁহার প্রশান্ত ও প্রসন্নভাব দর্শনে রাজাও প্রীত হইয়া তাঁহার হস্তধারণ পূর্ব্বক সম্মানসহকারে আসনে বসাইলেন। মহিষীর প্রতি অনেক প্রকার চাটুবাক্য প্রয়োগ করিলেন। ব্রতের নাম "প্রিয়প্রসাদন" জানিয়া বলিলেন, "যে দাস সর্ব্বদাই আপনার প্রসন্নতা লাভে প্রয়াসী তাহাকে কি আর প্রসন্ন করিতে হয় ?" মহিষী রাজার কথায় উত্তর না দিয়া রাজার অর্চ্চনা করিলেন ও চন্দ্র-রোহিণীকে সাক্ষী করিয়া প্রার্থনা করিলেন "আজ অবধি আর্য্যপুত্র যে স্ত্রীর কামনা করিবেন ও যে রমণী আর্য্যপুত্রের প্রতি আসক্তা, তাঁহাদের প্রণয়ের বাধা প্রদান

করিব না।" রাজার কথার উত্তরে বলিলেন "এই ব্রত সম্পাদন করিয়া সংযতভাবে থাকিতে হয় অতএব এক্ষণে আপনার সমীপে আমার অবস্থান উচিত নয়।" ইহা বলিয়া তিনি বিদায় লইলেন।

মহিষী ঔশীনরীর মহানুভবতা দেখিয়া সুরাঙ্গনা উর্ব্বশীও বিস্মিতা হইলেন। স্ত্রীজাতির মধ্যে স্বার্থত্যাগের এরূপ জলন্ত উদাহরণ আর কোথাও দেখা যায় না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে নিত্য সম্বন্ধ তাহাতে এরূপ নিজ স্বার্থের আহুতি দিয়া পতিপ্রেমরূপ যজ্ঞের উদ্‌যাপন আর কয়জন করিতে পারেন? একমাত্র ভারত-রমণীগণই পতিপ্রেমের এরূপ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারেন। পৃথিবীর আর কোন জাতির রমণীগণের মধ্যে এরূপ স্বার্থত্যাগ দেখা যায় না। মহিষী ঔশীনরী কালিদাসের অপূর্ব্ব সৃষ্টি। উদারতা ও স্বার্থত্যাগ মহিষীচরিত্রের উজ্জ্বল অংশ। এই ব্রত সাধনের পর আর তাঁহার দেখা পাওয়া যায় নাই।

মহিষীচরিত্র অনুশীলনের সময় আর একটী কথার উল্লেখ করা আবশ্যক। তিনি রাজার ধর্ম্মপত্নী সুতরাং রাজাকে নিবৃত্তি-মার্গে পরিচালিত করাই তাঁহার কার্য্য। উর্ব্বশী প্রবৃত্তিরূপা। উর্ব্বশীরূপ প্রবৃত্তির উত্তেজনায় যখন রাজার অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা লুপ্তপ্রায়, তখন আর ধর্ম্মপত্নীর নিবৃত্তিরূপ মনোবৃত্তির উপর কিছু মাত্র প্রভুত্ব থাকে না। প্রবৃত্তির প্রবলতাবশতঃ নিবৃত্তি আপনা হইতে অপসারিত হয়। রাজা পুরুরবা যখন উর্ব্বশীপ্রেমে নিতান্ত অধীর, তাঁহাকে না পাইলে হয়ত তাঁহার জীবনের প্রতিও মমতা থাকিবে না, ভোগেচ্ছা যখন তাঁহার এতদূর বলবতী হইয়াছে, তখন আর নিবৃত্তির আধিপত্য কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ধর্ম্মপত্নীর

আবশ্যকতা আর কোথায়? কাজেই কবি মহিষী ঔশীনরীকে এই অঙ্কেই বিদায় দিয়াছেন।

অতঃপর রাজা বিদূষকের সহিত পুনরায় উর্ব্বশীবিষয়ক কথারম্ভ করিলেন। রাজার ইচ্ছা হইল তাঁহার পশ্চাদ্দিক হইতে উর্ব্বশী আসিয়া তাঁহার চক্ষু চাপিয়া ধরিলে তাঁহার নিতান্ত সুখোদয় হয়। উর্ব্বশীও তাহাই করিলেন। রাজা ও উর্ব্বশীর মিলন হইল। পূর্ব্বে যে সকল দ্রব্য রাজার ক্লেশকর বোধ হইতেছিল এখন তাহাই আনন্দদায়ক অনুভূত হইতে লাগিল। উর্ব্বশী, মহিষীর নিকট দানপ্রাপ্ত রাজার দেহ অধিকার করিবার স্বত্ব সাব্যস্ত করিলেন।

উর্ব্বশীকে কবি সরলতার প্রতিমা করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। তিনি দেবযোনি-সম্ভবা। কাজেই পার্থিব মলিনতা তাঁহাতে থাকিতে পারেনা। ভয়, বিস্ময়াদি ভাবের প্রবলতা হইলেই তাঁহার মন একেবারে অভিভূত হইয়া পড়ে। প্রেমেও তদ্রূপ। রাজা তাঁহার প্রেমে অতিমাত্র আকুল হইলেও উর্ব্বশী রাজার প্রেমে একেবারে উন্মত্তা হইয়াছিলেন। নহিলে দেবসভায় অভিনয়-বিভ্রাট ঘটাইবেন কেন? রাজার নিকট প্রেমলিপিপ্রেরণে আরও অধীরতা প্রকাশ পাইয়াছে। আমাদের প্রাচীন কবিগণ প্রেমিকার প্রেমলিপি প্রেমিকের নিকট প্রেরণ অতিশয় অনুরাগপ্রকাশক মনে করিতেন। যাহা হউক উর্ব্বশীর সহিত যদি চিত্রলেখা না থাকিতেন, তাহা হইলে উর্ব্বশীর এক পদও অগ্রসর হইবার ক্ষমতা হইত না। লোকচরিত্র বিষয়ে চিত্রলেখার যেরূপ অভিজ্ঞতা উর্ব্বশীর তাহা ছিল না। একাকিনী হইলে উর্ব্বশী রাজার নিকট নিজের মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। চিত্রলেখা যেমন

তাঁহার হৃদয়বেদনা অনুভব করিয়া সহৃদয়তা দেখাইয়াছে সেইরূপ তাঁহাকে কর্ত্তব্য পথও দেখাইয়াছেন। চিত্রলেখাকে বিদায় দেওয়ার সময় সরলা উর্ব্বশী বড় কাতর হইলেন এবং করুণস্বরে বলিলেন—"সখি, আমাকে ভুলিও না।" চিত্রলেখা রহস্যচ্ছলে বলিলেন "এখন তুমি বয়স্যসহ সঙ্গতা হইলে, আমিই বরং তোমার নিকট উক্তরূপ প্রার্থনা করিব।" অতঃপর চিত্রলেখা বিদায় লইলেন। রাজা ও উর্ব্বশী নানা কথায় মণিহর্ম্মপৃষ্ঠে সেই জ্যোৎস্নাময়ী যামিনী অতিবাহিত করিলেন।

চতুর্থ অঙ্ক—রাজা পুরুরবা উর্ব্বশী-প্রেমে এতদূর উন্মত্ত হইয়াছিলেন যে মন্ত্রিকে রাজ্যভার দিয়া উর্ব্বশীর সহিত বিজন-বিহার-মানসে হিমালয় প্রদেশে গমন করেন। গন্ধমাদন বনে পরম সুখে উভয়ে দিনযাপন করিতেছেন। কিন্তু ভবিতব্য কে খণ্ডাইবে? একদিন উদয়বতী নামে বিদ্যাধর কন্যা বালুকায় ক্রীড়া পর্ব্বত রচনা করিয়া মন্দাকিনী তীরে খেলা করিতেছিল। রাজা অনুরাগভরে সেদিকে চাহিয়াছিলেন। উর্ব্বশী তাহা সহ্য করিবেন কেন? তিনিত আর মহিষী ঔশীনরী নহেন যে স্বামীর ভোগসুখের পথ উন্মুক্ত করিয়া নিজ স্বার্থ আহুতি দিবেন। রাজার দেহ ও মন অপ্রতিবন্ধভাবে ভোগ দখল করা তাঁহার ইচ্ছা। যে শয্যা উভয়ের অনুরাগরূপ উপাদানে নির্ম্মিত তাহাতে অপরের ছায়া পড়িলে তিনি ক্ষমা করিবেন কেন? উর্ব্বশী রাজার উপরোধ অনুরোধ না শুনিয়া, না মানিয়া, অভিমানভরে কুমার বনে প্রবেশ করিলেন। অমনই তাঁহার দেহ লতারূপে পরিণত হইল। এই কুমারবন ভগবান কার্ত্তিকেয়ের লীলাস্থান। স্ত্রীজাতি এ বনে প্রবেশ করিলেই লতা হইয়া যায়। উর্ব্বশীর প্রতিও ভরতের অভিশাপ ছিল। তজ্জন্য

উর্ব্বশীর এইরূপ ঘটল। এই বৃত্তান্ত আমরা উর্ব্বশীর সখী চিত্র-লেখার মুখে অবগত হই।

রাজা উর্ব্বশীর লতারূপ প্রাপ্তি জানিতেন না। সেই জন্য উন্মত্তভাবে তাঁহার অন্বেষণ করিয়া বনে বনে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে বিচরণ করিতেছেন। আষাঢ়ের নবমেঘোদয়ে ও বিদ্যুতের খেলায় কেশী দৈত্য কর্ত্তৃক উর্ব্বশী হরণের পুনরভিনয় মনে করিয়া রাজা প্রস্তর হস্তে প্রহারার্থ ধাবমান হইলেন। এইরূপ সরোবরস্থ হংস ও বন-স্থলীর ময়ূর, কুরঙ্গ, গজ প্রভৃতি সকলকেই উর্ব্বশীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেছেন। তাহারাও যেন প্রিয়াবিরহে কাতর বলিয়া রাজার অনুমান হইতেছে। অতঃপর সঙ্গমণির স্পর্শে লতারূপা উর্ব্বশী পুনরায় নিজরূপ প্রাপ্ত হইলেন। রাজাও পরমানন্দে তাঁহাকে লইয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

এই অঙ্কে রাজার উন্মাদ অবস্থার বর্ণনা কবির অতিমাত্র কৃতী-ত্বের পরিচায়ক। বর্ণনা দীর্ঘ হইলেও, এতদূর স্বাভাবিক ও হৃদয়গ্রাহী যে পাঠ করিলেই মোহিত হইতে হয়। যাঁহারা পরকীয়া রমণীর প্রেমে প্রেমিক পুরুষের ব্যাকুলতা দেখিয়া-ছেন, তাঁহারাই এই অঙ্কের যথার্থ ভাবগ্রহণে সমর্থ। উর্ব্বশী রাজার কামপত্নী। যতক্ষণ উভয়ের অনুরাগ উভয়ের প্রতি থাকিবে ততক্ষণ উভয়ের সম্বন্ধ। কামপত্নীতে মত্ত হইলে পুরুষের কিরূপ ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটে তাহা কবি দেখাইয়াছেন। দেবযোনিসম্ভূতা অপ্সরাও কামপত্নী হইলে যে পুরুষের নানা কষ্টভোগ করিতে হয়, তাহা দেখানই কবির উদ্দেশ্য। নহিলে মহিষীর সহবাসে এতদিন ত রাজার বাতুলতা আসে নাই। উর্ব্বশী প্রবৃত্তি, মহিষী নিবৃত্তি—একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইলে পরিণামে

কিরূপ বিষময় ফল উৎপন্ন হয় তাহা এই অঙ্কপাঠে জানিতে পারা যায়।

পঞ্চমাঙ্ক—রাজা উর্ব্বশীর সহিত রাজধানীতে আসিয়াছেন। তাঁহাদের আগমনে সকলেই আহ্লাদিত হইয়াছে। পুণ্যদিনে রাজা উর্ব্বশীকে লইয়া গঙ্গাযমুনা সঙ্গমে স্নান করিতে আসিয়াছেন। রাজা স্নানান্তর অটবাসগৃহে অঙ্গ সংস্কার জন্য প্রবেশ করিয়াছেন। উর্ব্বশীও নিজ পটমণ্ডপে গমন করিয়াছেন। এমন সময়ে একটী গৃধ্র আমিষ বোধে রাজার সেই সঙ্গমনীয় মণি অপহরণ করিল। একটা গণ্ডগোল পড়িল। রাজা বেশভূষা সম্যক সম্পাদন না করিয়াই বাহিরে আসিলেন এবং গৃধ্র রাজার অবধ্য হইলেও ধনুর্ব্বাণ আনিবার আদেশ দিলেন। কিন্তু গৃধ্র তখন লক্ষ্যের বহির্ভূত হইয়াছে। কাজেই রাজা আদেশ দিলেন যে, রাত্রিকালে গৃধ্র যে বৃক্ষে আশ্রয় লইবে নাগরিক লোকেরা তাহা যেন অনুসন্ধান করিয়া দেখে।

অতঃপর রাজা ও বিদূষক মণিসম্বন্ধেই কথোপকথন করিতেছেন এমন সময়ে শরবিদ্ধ গৃধ্র মণি সহিত আনীত হইল। যে শর গৃধ্রদেহ ভেদ করিয়াছিল তাহার নামাক্ষর পাঠ করিয়া রাজা দেখিলেন, তাঁহারই ঔরসে উর্ব্বশীর গর্ভজাতকুমার আয়ুর বাণে গৃধ্র নিহত হইয়াছে। কিন্তু রাজা কখনও উর্ব্বশীর গর্ভলক্ষণ প্রকাশিত হইতে দেখেন নাই। কাজেই বুঝিতে পারিলেন না, উর্ব্বশী পুত্র প্রসব করিয়া কেন গোপনে রাখিয়াছেন। বিদূষক পরিহাস করিয়া বলিল বৃদ্ধা হইলেও রাজা উর্ব্বশীকে পরিত্যাগ করিবেন না বলিয়া তিনি পুত্র গোপন করিয়াছেন। এইরূপ রহস্যালাপ হইতেছে এমন সময়ে চ্যবন মুনির আশ্রম হইতে এক তাপসী একটী

বালক সঙ্গে লইয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন এবং বালকটী যে রাজার ঔরস পুত্র আয়ু এবং জন্মমাত্র উর্ব্বশী তাহাকে তাঁহার নিকট রাখিয়াছিলেন এই পরিচয় দিলেন। অতঃপর সে আশ্রমবিরুদ্ধ কার্য্য অর্থাৎ গৃধ্র বধ করায় মহর্ষি তাহাকে রাজার নিকট পাঠাইয়াছেন। অনন্তর তাপসী বিদায় হইলেন। রাজা উর্ব্বশীর সহিত কথাপ্রসঙ্গে দেবরাজ ইন্দ্রের নামোল্লেখ করিলেন। অমনি উর্ব্বশীর চক্ষু হইতে অবিরল অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। রাজা কারণজিজ্ঞাসু হইলে উর্ব্বশী বলিলেন—"মহারাজ, দেবরাজ আমাকে বলিয়াছিলেন 'যখন আমার প্রিয়সখা সেই রাজর্ষি তোমার গর্ভজাত পুত্রমুখ দর্শন করিবেন, তখন তুমি আমার নিকট আগমন করিবে।' মহারাজের সহিত চিরসম্মিলনমানসে আমি কুমারকে চ্যবনাশ্রমে রাখিয়াছিলাম। এক্ষণে সে পিতার আরাধনায় সমর্থ হইয়াছে, সুতরাং আমার সহিত আপনার সহবাস শেষ।" রাজা বিষণ্ণচিত্তে তখনই পুত্রকে রাজ্যভার দিয়া বনগমনের আয়োজন করিলেন। কেন না উর্ব্বশী অভাবে তিনি কি করিয়া থাকিবেন? উর্ব্বশীর স্বর্গগমনের পূর্ব্বে রাজা বনগমন করিবেন এইরূপ আয়োজন হইতেছে এমন সময় দেবর্ষি নারদ তথায় আগমন করিলেন। রাজা যথারীতি তাঁহাকে বন্দনা করিলে তিনি রাজাকে বলিলেন—"অচিরে দেবাসুরে যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা। এজন্য এক্ষণে আপনি বনগমন করিলে দেবরাজ নিতান্ত সহায়হীন হইবেন; অতএব যতদিন আপনি জীবিত থাকিবেন ততদিন উর্ব্বশী আপনার নিকট থাকিবেন।" মহর্ষির বাক্যশ্রবণে সভাস্থ সকলেই নিরতিশয় আনন্দিত হইলেন। সংগৃহীত দ্রব্যাদিতে মহর্ষি স্বয়ং কুমার আয়ুকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। কালিদাসের বিক্রমোর্ব্বশীও সমাপ্ত হইল।

শেষ অঙ্কে স্ত্রীচরিত্রের প্রেমোন্মত্ততার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত কবি দেখাইয়াছেন। স্ত্রীলোকেরা পুত্রবর্জ্জন করিয়াও পতিপ্রেম পাইতে ইচ্ছা করে।

এই নাটক পাঁচটী মাত্র অঙ্কে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। ইহার নামকরণ সম্বন্ধে বলিতে পারা যায় যে, পুরুরবা বিক্রমের দ্বারাই উর্ব্বশীর অনুরাগ লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং পুরুরবার বিক্রমের জন্যই দেবরাজ ইন্দ্র উর্ব্বশীকে মর্ত্তলোকে আনিয়া পুরু-রবার সহিত বাস করিবার অনুমতি প্রদান করেন। তাঁহার বিক্রমের জন্যই দেবরাজ উর্ব্বশীকে রাজার জীবিতকাল পর্য্যন্ত মর্ত্তে থাকিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। কেননা দেবাসুরের ভাবী-যুদ্ধে পুরুরবার সহায়তা লাভের প্রয়োজন। বিক্রমেই যাহা অর্জ্জিত, বিক্রম দ্বারাই তিনি তাহা রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এইজন্যই নাটকের এইরূপ নামকরণ হইয়াছে।

মালবিকাগ্নিমিত্র।

এই ক্ষুদ্র নাটক কালিদাস প্রণীত বলিয়া উল্লিখিত দেখা যায়। কিন্তু অনেকে ইহাকে রঘুকার কালিদাস প্রণীত বলিয়া স্বীকার করেন না। এই নাটকের প্রস্তাবনায় পূর্ব্ব-তন কবিগণের নামগ্রহণ কালে গ্রন্থকার ধাবক নামের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রবাদ অনুসারে ধাবক রত্নাবলীপ্রণেতা। রাজা শ্রীহর্ষ অর্থদানে বশীভূত করিয়া ধাবকের নামের পরিবর্ত্তে নিজ নামে রত্নাবলী প্রচলিত করেন। সুতরাং ধাবক নামের উল্লেখ দেখিয়া মালবিকাগ্নিমিত্রের রচনাকাল রত্নাবলীর পরে ধরিতে হয়। তাহা হইলে এ নাটক রঘুকার কালিদাসের লেখনীনিঃসৃত হইতে

পারে না। কিন্তু বোম্বাই অঞ্চলের পুস্তকে ধাবক স্থানে "ভাষ" পাঠ ধৃত হইয়াছে। তাহা দেখিয়া ইহাকে কালিদাস প্রণীত বলিতে পারা যায়। পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয় এ নাটকখানি কালিদাসের প্রথম কালের রচনা মনে করিয়াছিলেন। এজন্য আমরা ইহার বিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক মনে করি না।

ঋতুসংহার।

ইহা একখানি খণ্ডকাব্য। ছয় সর্গে বিভক্ত। ইহাতে যথাক্রমে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শিশির ও বসন্ত বর্ণিত হইয়াছে। এই বর্ণনা স্বভাবোক্তিতে পূর্ণ। কালিদাস গ্রীষ্মকালের যে চিত্র প্রদান করিয়াছেন তৎপাঠে তাঁহার ভূয়োদর্শনের যথেষ্ট সুখ্যাতি করিতে হয়। বনবাসী মৃগ, বরাহ, মহিষাদি জন্তুগণের জলান্বেষণে ভ্রমণ অতিমাত্র নিপুণতার সহিত চিত্রিত হইয়াছে। ভট্টিকাব্যের শরদ্বর্ণনা, কুমারসম্ভবের অকালবসন্ত বর্ণনা, আর ঋতুসংহারের গ্রীষ্মবর্ণনা অতুলনীয় মনে হয়। তবে কালিদাস যেরূপ স্বভাবানুসরণ করিয়াছেন ভট্টি তাহা করেন নাই।

নলোদয়।

ইহাও একখানি খণ্ডকাব্য, চারি সর্গে বিভক্ত। ইহাতে নলদময়ন্তীর উপাখ্যান সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। প্রবাদ আছে, ঘটকর্পরের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য এই খণ্ডকাব্য প্রণীত হইয়াছিল। ঘটকর্পর ক্ষুদ্র একখানি যমক কাব্য রচনা করিয়া গর্ব্বসহকারে বলিয়াছিলেন—"জীয়েয় যেন কবিনা যমকৈঃ পরেণ। তস্মৈ বহেয়মুদকং ঘটকর্পরেণ।" কালিদাস নলোদয় রচনা করিয়া

তাঁহাকে অপ্রতিভ করেন। নলোদয়ে যমকের দিকে দৃষ্টি অধিক রাখায় কবি তাদৃশ রচনানৈপুণ্য দেখাইতে পারেন নাই। আজ-কাল এ কাব্যখানিও কালিদাস প্রণীত বলিয়া অনেকেই স্বীকার করেন না।

সমাপ্ত।